জীবন ও জীবিকা

দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বিজয় উল্লাস : ১৯৭১

১৯৪৭ সাল থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) জনগণ সর্বপ্রকার অত্যাচার, শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন এবং ২৬শে মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয় নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান, শিশু-কিশোরসহ সর্বস্তরের জনগণ। পাকিস্তানি সেনাদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার ২ লাখের অধিক মা-বোনের ত্যাগ এবং ৩০ লক্ষ বাঙালির প্রাণের বিনিময়ে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করে বাংলাদেশ। বিশ্ব ইতিহাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের প্রথম দেশ, যে দেশ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

জীবন ও জীবিকা

দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সম্পাদনা

মোঃ মুরশীদ আকতার
মোসাম্মৎ খাদিজা ইয়াসমিন
সৈয়দ মাহফুজ আলী
ড. প্রবীর চন্দ্র রায়
মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম
শাকিল আহমেদ
মোঃ সিফাতুল ইসলাম
মোহাম্মদ আবুল খায়ের ভূঁঞা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২২

শিল্পনির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

চিত্রণ ও প্রচ্ছদ

প্রমথেশ দাস পুলক

গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বিষয় পরিচিতি

অনেক দৃশ্য আমাদের মন ভালো করে দেয়। এই যেমন, পাখিরা যখন ডানা মেলে আকাশে ওড়ে, তখন ওদের কত সুখী ও নির্ভার মনে হয়। তখন আমাদেরও ইচ্ছা করে, ওদের মতো ডানা মেলে উড়তে! ছোটবেলা থেকে এ রকম কত অদ্ভুত ও মজার স্বপ্ন আমাদের মনের আকাশে উঁকি দেয়। আমরাও চাই জীবনকে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আনন্দময় করে তুলতে। এমন কাজের সাথে নিজেকে জড়াতে, যা করতে ভালো লাগে। চাই আগামী দিনগুলোতে সুন্দর ও নিরাপদভাবে বাঁচতে।

এসব প্রত্যাশাকে সামনে রেখে এবারের শিক্ষাক্রমে 'জীবন ও জীবিকা' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা কীভাবে আনন্দ নিয়ে কাজ করতে পারে, এখানে তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রয়াসে সে পথ উন্মুক্ত হবে বলে আমরা মনে করি। সময়ের স্রোতে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে আমাদের অনেক পরিবর্তন এসেছে। পরিবারের মা-বাবাসহ অন্যান্য সবার ব্যস্ততা বেড়ে গেছে। ফলে ছোটবেলা থেকে আমাদেরকে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে হবে। আমরা আশা করি, 'জীবন ও জীবিকা' বিষয়টির মাধ্যমে শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে নিজের জীবনের ইতিবাচক দিকগুলোর সাথে পরিচিত হবে। একইসাথে আগামী দিনে নিজেকে সুন্দরভাবে টিকিয়ে রাখার কৌশলগুলো রপ্ত করতে পারবে। তাছাড়া অনাগত দিনগুলোতে জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলোর পরিচর্যা ও অনুশীলন করতে পারবে। যেকোনো কাজে আনন্দময় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যেন দক্ষতা অর্জন করা যায় এবং শিক্ষার্থীরা যেন দেশ ও জাতির প্রতি দায়বদ্ধ আচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, সেভাবে বিষয়টির নকশা করা হয়েছে। এর সফলতার জন্য সবার ইতিবাচক অংশগ্রহণ জরুরি।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, শিক্ষকগণ তোমাদের যে কাজগুলো দেবেন, সেগুলো নিজের সৃজনশীলতা খাটিয়ে সুন্দরভাবে করার চেষ্টা করবে এবং নির্ধারিত সময়ে কাজগুলো করবে। প্রয়োজনে অভিভাবক, পাড়া-প্রতিবেশীর সহায়তা নেবে। অভিভাবকগণের প্রতি অনুরোধ, আপনারা শিক্ষার্থীদের জন্য অনুকূল ও আন্তরিক পরিবেশ তৈরি করে তাদের কাজগুলোতে যথাসাধ্য সহায়তা করবেন এবং তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করবেন। সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণেই সম্ভব সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

সূচিপত্র

কাজের মাঝে আনন্দ	১ - ২৭
পেশার রূপ বদল	২৮ - ৪৩
আগামীর স্বপ্ন	৪৪ - ৫৮
আর্থিক ভাবনা	৫৯ - ৭৮
আমার জীবন আমার লক্ষ্য	৭৯ - ৯৬
দশে মিলে করি কাজ	৭৯ - ১১২
স্কিল কোর্স-১: কুকিং	১১৩ - ১৩২
স্কিল কোর্স-২: গ্রাফটিং বা জোড়কলম	১৩৩ - ১৪২

কাজের মাঝে আনন্দ

নিজের হাতে করি কাজ
তাতে নেই কোনো লাজ।

সুমি ও রনি দুই ভাইবোন। ওরা প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজেদের বিছানা পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখে। এরপর দাঁত ব্রাশ করে হাত মুখ ধোয়। নিজেদের পড়ার বই খাতা, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি ব্যাগে গুছিয়ে রাখে। এগুলো শেষ হলে ওরা রান্নাঘরে গিয়ে বাবা-মায়ের কাজে সাহায্য করে। ওরা কখনো পানি এগিয়ে দেয়, কখনো রান্নার ঘরের আবর্জনা বাইরের ময়লার পাত্রে/ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে আসে। আবার কখনো খাবার-দাবার বাটিতে গুছিয়ে খাওয়ার স্থানে এনে রাখে। এজন্যে বাবা-মা খুশি হয়ে দুজনকেই অনেক আদর করেন। সবাই মিলে সকালের নাস্তা খাওয়া শেষ হলে তারা নিজের প্লেট, বাটি ও মগ ধুয়ে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে আসে। এরপর আগে থেকে গুছিয়ে রাখা পরিষ্কার পোশাক পরে বিদ্যালয়ে যায়। বিদ্যালয়ে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে অনেক মজা করে।

এবার এসো, সুমি ও রনির মতো আমরা নিজেদের বাড়িতে যেসব কাজ করি তা নিচের ছকে লিখি—

ছক ১.১: প্রতিদিনের কাজের তালিকা

বিভিন্ন সময়ের কাজ	নিজের কাজ	পরিবারের কাজ
সকালে যা করি		
বিকেলে যা করি		
রাতে যা করি		
ছুটির দিনে যা করি		

নিজের কাজ

আমরা প্রতিদিন নিজেদের এবং অন্যের জন্য অনেক কিছু করি। নিজের কাজ নিজে করায় বেশ আনন্দ আছে। অন্যদের ওপর নির্ভরশীলতাও কমে। এতে শরীর ও মন ভালো থাকে। তাছাড়া, আমাদের বাবা-মা, ভাই-বোন, অভিভাবকগণ সবসময় আমাদের ভালো রাখার জন্য উপার্জন ও পারিবারিক কাজে ব্যস্ত থাকেন। আমরা নিজেদের কাজগুলো নিজেরা করে নিলে তাদের উপর থেকে চাপ কমে যায়; ফলে তারাও আমাদের অনেক ভালোবাসেন। আমাদের কিছু কাজ রয়েছে একেবারে ব্যক্তিগত; যেমন- দাঁত ব্রাশ করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, পোশাক পরিধান করা, গোসল করা, খাবার খাওয়া, খেলাধুলা করা ইত্যাদি। এগুলো ছাড়াও নিজের বিছানা গোছানো, খাবারের প্লেট ধোয়া, ব্যবহার্য জিনিসপত্র, খেলনা, বই-খাতা ইত্যাদি গুছিয়ে রাখা, কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে রাখা ইত্যাদিও আমাদের নিজেদের কাজ। দাঁত ব্রাশ, খাওয়া, ঘুমের মতো একেবারে ব্যক্তিগত পরিচর্যামূলক কাজগুলো ছাড়াও নিজেদের ব্যক্তিগত পরিপাটিমূলক এই কাজগুলোকে প্রায়ই আমরা এড়িয়ে যেতে চাই । আবার কখনো অন্যের ওপর নিজেদের এই কাজগুলো চাপিয়ে দিই কিংবা এগুলোর জন্য অন্যের ওপর নির্ভর করি। অথচ খাওয়া ও ঘুমানোর মতো ব্যক্তিগত এই কাজগুলোও আমাদের নিজেদেরই।

চিত্র ১.১: আমাদের নিজের কাজ

আমরা প্রতিদিনই নিজেদের কাজ কিছু না কিছু করে থাকি তবে সবার মনে রাখতে হবে, এগুলো প্রত্যেকের জন্যই করা বাধ্যতামূলক। তাহলে চলো, আমরা নিজেদের কাজের একটি তালিকার সাথে পরিচিত হই, যা প্রত্যেকেরই নিয়মিত করা উচিত।

আমাদের নিজেদের যা যা করতে হবে-

১. নিজের বিছানা গোছানো

২. সময়মতো পড়াশুনা করা

৩. পড়ার টেবিল/বই-খাতা-কলম ইত্যাদি গুছিয়ে রাখা

৪. নিজের খাবারের প্লেট, মগ, চামচ ইত্যাদি ধোয়া এবং গুছিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে রাখা

৫. কাপড়-চোপড়, জুতা-মোজা, নিজের ব্যবহারের জিনিসপত্র ইত্যাদি গুছিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে রাখা

৬. খাবারের সময় বিশেষ আদব-কায়দা ও রীতিনীতি মেনে চলা

৭. নিজের পরিচ্ছন্নতার বিষয়গুলো সতর্কতার সঙ্গে পালন করা ইত্যাদি

আমাদের মনে রাখতে হবে, নিজের কাজ নিজে করার মাঝে সামর্থ্য থাকার পরও অন্যকে দিয়ে করানোর মধ্যে কোনো বীরত্ব বা কৃতিত্ব নেই। তাই নিজের কাজগুলো নিজেরই করা উচিত। তা না হলে অন্যের হাসির পাত্র হয়ে থাকতে হয় অথবা পরনির্ভরশীলতার জন্য অন্যের বোঝা হয়ে থাকতে হয়; যা খুবই ভোগান্তির। তাছাড়া এই কাজগুলো আমরা নিজেরা করলে বাড়ির অন্যান্য সদস্য, যারা আমাদের কাজগুলো করেন, তারা একটু অবসর পান। ফলে তারা আমাদের সঙ্গে সময় কাটানো, গল্প করা ও খেলার সুযোগ পান। এতে পারিবারিক সম্পর্ক অনেক মধুর হয়। তাছাড়া নিজের কাজ নিজে করলে আরও কিছু সুবিধা আছে, যেমন—

- নিজের মনের মতো অর্থাৎ নিজের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী কাজ করা যায়।
- নিয়মিত করার মাধ্যমে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়।
- সৃজনশীলতা বিকশিত হয়, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।
- অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমে।
- অর্থ ও সময়ের সাশ্রয় হয়।
- শরীর ও মন প্রফুল্ল থাকে ইত্যাদি।

তাহলে চল, প্রত্যেকেই শপথ নিই-

আজ থেকে আমার কাজ আমি করি,

সুন্দর একটা জীবন গড়ি।

পরিবারের কাজ

বাড়িতে পরিবারের সব সদস্যই গুরুত্বপূর্ণ। সবারই ভালো থাকা এবং ভালোভাবে সময় কাটানোর অধিকার আছে। কিন্তু সবাইকে ভালো রাখার দায়িত্ব যদি পরিবারের এক বা দুইজনের ওপর ন্যস্ত থাকে তাহলে তাদের জন্য এটা খুবই কষ্টকর। তাই সবাই যদি নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী পারিবারিক কাজে একটু সহায়তা করি, তাহলে পরিবারের সদস্যদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। খুশি হয়ে তারা তখন আমাদের অনেক বেশি ভালোবাসবেন।

চিত্র ১.২: আমাদের পরিবারের কাজ

পরিবারের বিভিন্ন কাজ যেমন- রান্নার কাজে সাহায্য করা, বাগানে পানি দেওয়া, পোষা প্রাণী/গবাদি পশুর খাবার দেওয়া, সেগুলোর থাকার স্থান পরিষ্কার করা, ঘর সাজানো/গোছানো, পানি সংগ্রহ করা, নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, থালা-বাসন ধোয়া, ঘর গোছানো, ছোট ভাইবোনদের যত্ন করা, বয়স্ক/প্রবীণদের সেবা করা ইত্যাদি। এগুলো কি খুব কঠিন কাজ? মোটেও না; বরং আমরা সবাই একটু সচেতন হয়ে যদি এই কাজগুলো নিয়মিত করি অথবা করার ক্ষেত্রে আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের সাহায্য করি, তাহলে আমাদের শরীর ও মন দুটোই ফুরফুরে থাকবে।

এসো সবাই বিশ্বাস করি—

পরিবারের কাজে হাত যদি লাগাই
বাজবে ঘরে সুখের সানাই।

শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ করে দুটি পোস্টার বানাও

- পরিবারের কাজের উপায় ছুটি আলাদা পোস্টার নিজেদের ইচ্ছেমতো ডিজাইন করো।
- দুটি পোস্টারে মজার দুটি শিরোনাম দাও।
- চিত্র/ছবি/কোলাজ/কার্টুন/লেখা/পেপার কাটিং ইত্যাদি যেকোনো কিছু দিয়ে পোস্টার সাজাতে পারো।

বাঁচতে হলে শিখতে হবে, লড়াইতে জিততে হবে

পৃথিবীজুড়ে কোভিড-১৯ সংক্রমণের প্রথম দিকের ঘটনা। হাসপাতালে পাশাপাশি বেডে সুমির বাবা এবং লিটুর মাকে অক্সিজেন দিয়ে রাখা হয়েছে। আট দিন আগে সুমির বাবার কোভিড পজিটিভ ধরা পড়ায় তাকে নিয়ে তার মা হাসপাতালে ভর্তি হন। হাসপাতালে যাওয়ার দুই দিন পরে সুমির মা-ও পজিটিভ হন। এই ঘটনা শোনার পর বাড়ির কাজে সহায়তাকারী কাজে আসা বন্ধ করে দেন। ফলে সুমিকে বাড়িতে ওর দাদীর সঙ্গে একা থাকতে হয়। আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশী কেউ-ই ভয়ে সুমিদের বাসায় এসে থাকতে রাজি হয়নি। সুমি তার কাপড়-চোপড়, জিনিসপত্রে পুরো ঘর খুব এলোমেলো করে ফেলে দুই দিনেই। প্রথম কয়েক দিন সুমি ওর দাদীকে নিয়ে ফ্রিজে রাখা খাবার খেয়ে কাটিয়ে দেয়। কিন্তু চতুর্থ দিনে ফ্রিজের সব খাবার শেষ হয়ে যায়। এদিকে সুমির বাবার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যাওয়ায় তাকে বাড়িতে নিয়ে আসাও সম্ভব হচ্ছিল না।

সুমির দাদী অনেক বৃদ্ধ হওয়ায় তিনি রান্নাবান্না করতে পারেন না। ফলে কোনো খাবারই প্রস্তুত করতে না পারায় পঞ্চম দিন সে আর দাদী প্রায় না খেয়েই কাটাল। ষষ্ঠ দিনে সুমির মা বাড়ীর দারোয়ানকে অনুরোধ করে কিছু শুকনো খাবার কিনে পাঠালেন। দারোয়ান সে খাবার সিঁড়িতে রেখে চলে গেলেন। সুমি বের হয়ে দেখে, গ্রিলের ফাঁক দিয়ে দুটো কাক এসে পলিথিনে রাখা খাবার ঠোকরা-ঠুকরি করে খাওয়া শুরু করেছে। দেখে ওর ভীষণ কান্না পেল।

তবু ক্ষুধার জ্বালায় নিরুপায় হয়ে সে তার দাদীকে নিয়ে ওই খাবারই খেলো। সপ্তম দিনে ইউটিউব দেখে সে ভাত রান্নার চেষ্টা করতে গেল এবং গরম হাড়িতে হাত লেগে এক জায়গায় ফোস্কা পড়ে গেল। এদিকে এঁটো বাসন-কোসন আর ময়লা পচা গন্ধে রান্না ঘরে ঢুকতেও তার কষ্ট হচ্ছিল। অষ্টম দিনে তাদের খাবার পানিও শেষ হয়ে গেল। ঘর থেকে বের হওয়া নিষেধ থাকায় বেচারা দোকানে গিয়ে কিছু কিনে খাবে সে অবস্থাও নেই। এভাবে থাকতে গিয়ে দাদী ও নাতনি দুইজনে অসুস্থ হয়ে পড়ল।

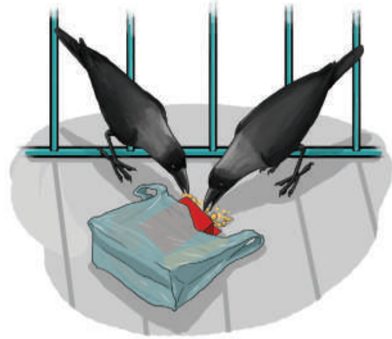

এই অবস্থায় সুমির মাকে কাঁদতে দেখে পাশের বেডের রোগীর সঙ্গে থাকা লিটুর বাবা কারণ জানতে চান। পুরো ঘটনা শুনে তিনি খুব ব্যথিত ও হতবাক হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি লিটুকে ফোন করে সুমিদের বাড়িতে ওদের জন্য খাবার পৌঁছে দিতে বলেন।

এরপর লিটুর বাবা সুমির মায়ের সঙ্গে তাদের পরিবারের গল্প বলতে শুরু করলেন।

তারা দুজনেই কর্মজীবী। প্রতিদিন সকালে কাজে যান এবং সন্ধ্যায় বাসায় ফেরেন। সকালে কাজে যাওয়ার আগে খাবার বানানোর কাজে তাদের দুই সন্তান লিটু ও রেখা সাহায্য করে। লিটু পানি এনে দেয়, রান্নাঘরের ময়লা পরিষ্কার করে, ঘর ঝাড়ু দেয়। লিটুর বোন রেখা কথা বলতে পারে না, কিন্তু ইশারা-ইঙ্গিত বুঝতে পারে। সে-ও সকালে তার বিছানা গোছায়, বাবাকে কাপড় ধোয়ায় সাহায্য করে এবং বাবা-মায়ের টিফিন বক্সে খাবার গুছিয়ে দেয়। ওর মা রান্না শেষ করে ওদের খাবার গুছিয়ে কাজে যান।

ওরা সবাই মিলে সকালেই ঘরের কাজ শেষ করে। এজন্যে বিকেল বেলা ওরা স্কুল থেকে ফিরে খেলতে পারে। তারা বাসায় ফিরে ওদের সঙ্গে কখনো গল্প করেন, কখনো-বা লুডু খেলে সময় কাটান। ছুটির দিনে সবাই মিলে ঘরের কাজ শেষ করে ওরা পার্কে বেড়াতে যায়। মাঝে মাঝে তারা অফিসের কাজে শহরে যান। তাতেও তাদের দুই সন্তানের তেমন কোনো সমস্যা হয় না। ওরা নিজেদের জন্য টুকটাক খাবার প্রস্তুত করতে পারে। ঘরের কাজ গুছিয়ে বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা করে। তারা সব সময় বাচ্চাদের কাজের প্রশংসা করেন এবং তাদের দুজনকেই ভীষণ ভালোবাসেন। তাই এখন তারা হাসপাতালে থাকলেও বাচ্চাদের না খেয়ে থাকার মতো কোনো বিপদে পড়তে হয়নি।

চিত্র ১.৩ : লিটুদের বাড়ির রান্নাঘর

একটু পরেই সুমির ফোন এলো, ‘মা, লিটু নামের একটি ছেলে আমাদের খাবার দিয়ে গেছে; দাদী আর আমি খেয়েছি। আর লিটু আমাকে সহজে খিচুড়ি রান্না শিখিয়ে দিয়ে গেছে। রাতের জন্য রান্নাও করেছি। তুমি কোনো চিন্তা করো না’।

পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীতে সব সময় আমরা একই রকম অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতে পারব- এমনটি না-ও হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য যদি সবসময় পরিবারের সদস্য অথবা সাহায্যকারীর ওপর নির্ভর করি, তাহলে যেকোনো সময় যেকোনো ধরনের ঝুঁকিতে পড়তে পারি। যেমন, হঠাৎ হয়তো মা-বাবা কিংবা যার কাজের ওপর আমরা নির্ভরশীল তিনি অসুস্থ হয়ে যেতে পারেন, মারা যেতে পারেন অথবা অন্যত্র চলে যেতে পারেন। যদি আমরা নিজেরা নিজেদের এবং পারিবারিক কাজগুলো না শিখি, তাহলে আমাদের জীবন তখন দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রত্যেকেরই উচিত ছোটবেলা থেকে যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করার অভ্যাস তৈরি করা। কাজ করার এই অভ্যাস আমাদের সুস্থ ও সুন্দর থাকতে সহায়তা করবে এবং যেকোনো অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে সাহস ও শক্তি জোগাবে; আমাদের আত্মবিশ্বাস (Self-Confidence) বাড়িয়ে দিবে। ঝুঁকিপূর্ণ যেকোনো অবস্থা মোকাবিলায় এটি একটি বড় অস্ত্র। এ কারণে প্রত্যেকের জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের কাজ নিজে করা বাধ্যতামূলক। এ বিষয়ে কোনো ছাড় দেওয়া বা অবহেলা করা একদম চলবে না। এর পাশাপাশি পরিবারের কাজেও আমাদের সবাইকে হাত লাগাতে হবে।

নিজের কাজ এবং পরিবারের কাজের পরিকল্পনা

ছক ১.২ এ প্রথমে নিজের কাজের তালিকা তৈরি করো। এবার কোন কাজটি কখন করবে তার একটি পরিকল্পনা অন্য একটি কাগজে লিখে রাখো। যে কাজগুলো করেছো প্রতিদিন ঘুমাতে যাওয়ার আগে সেগুলোতে টিক (✓) চিহ্ন দাও এবং খুঁজে দেখো পরিকল্পনায় রাখা সবগুলো কাজ করেছো কিনা। যদি কোনো কাজ তুমি করতে না পারো, তাহলে কাজটি করতে না পারার কারণ আত্মপ্রতিফলন কলামে লেখ এবং তোমার অভিভাবক/পরিবারের যেকোনো বড় সদস্যের কাছ থেকে প্রতি সপ্তাহে মতামত নিয়ে রাখো। সাত দিন শেষ হলে শিক্ষকের কাছে জমা দাও।

ছক ১.২: নিজের কাজের সাপ্তাহিক পরিকল্পনা ও অনুশীলন

	নিজ পরিকল্পিত কাজ	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ:	শুক্র	শনি	আত্ম প্রতিফলন
১.	নিজের বিছানা গোছানো								
২.	সময়মতো পড়াশুনা করা								
৩.	পড়ার টেবিল/বই-খাতা-কলম গোছানো								
৪.	নিজের প্লেট, মগ, চামচ ধোয়া এবং গোছানো								
৫.	কাপড়, জুতা, মোজা ও জিনিসপত্র গোছানো								
৬.	খাবারের সময় বিশেষ আদব-কায়দা মেনে চলা								
৭.	নিজের পরিচ্ছন্নতার বিষয়গুলো পালন করা								
অভিভাবকের মতামত:									
শিক্ষকের মন্তব্য:									

উপরের ছকটিতে প্রথম সপ্তাহের হিসাব শিক্ষককে দেখানোর পর বাড়িতে নিজেদের জন্য একটি রুটিন তৈরি করো। রুটিনে লেখা কাজ প্রতিদিন করছো কিনা তা নিজেরাই যাচাই করো।

ছক ১.৩ এ পরিবারের কোন কাজগুলো তুমি নিয়মিত করতে চাও তার একটি তালিকা তৈরি করো। এবার অন্য একটি কাগজে কাজগুলো কীভাবে করবে তার একটি পরিকল্পনা তৈরি করো। প্রতিদিন ঘুমাতে যাওয়ার আগে যে কাজগুলো করেছো সেগুলোতে টিক (✓) চিহ্ন দাও এবং খুঁজে দেখো পরিকল্পনায় রাখা সবগুলো কাজ করেছ কিনা। যদি কোনো কাজ তুমি করতে না পারো, তাহলে কাজটি করতে না পারার কারণ পাশের আত্মপ্রতিফলন কলামে লেখো এবং তোমার অভিভাবক/পরিবারের যেকোনো বড় সদস্যের কাছ থেকে প্রতি সপ্তাহে মতামত নিয়ে রাখো। সাত দিন শেষ হলে শিক্ষকের কাছে জমা দাও।

ছক ১.৩: পরিবারের কাজের সাপ্তাহিক পরিকল্পনা ও অনুশীলন

পরিবারের জন্য পরিকল্পিত কাজ (যে সব কাজ করবে তার তালিকা)		রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহ:	শুক্র	শনি	আত্ম প্রতিফলন	অভিভাবকের মতামত
১.										
২.										
৩.										
৪.										

সুখ যেকোনো ব্যক্তির জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। বাবা-মা এবং পরিবারের সন্তুষ্টির সঙ্গে সন্তানের আনন্দ সম্পর্কিত। শিশু খুশি থাকলে পরিবারের লোকজন রোমাঞ্চিত হয়, শিশু আরও ভালো কিছু করলে পরিবার পরম তৃপ্তি লাভ করে। পরিবারের এই তৃপ্তি আমাদের মনোজগতে সুখবোধ তৈরি করে। তাই সবার ভালো থাকার জন্য নিজেদের কাজ নিজেরা করা এবং পরিবারের সঙ্গে কাজ ও আনন্দ ভাগাভাগি করার মানসিকতা ছোটবেলা থেকেই গড়ে তোলা প্রয়োজন। তা না হলে একধরনের স্বার্থপরতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা মনোজগৎকে আক্রান্ত করতে পারে। সুতরাং তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, ছোটবেলা থেকে নিজের কাজ নিজে করা এবং পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের কাজে হাত লাগিয়ে তাদের সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়ানোর চর্চা করা আমাদের সবার দায়িত্ব। এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলে মানসিক তৃপ্তি পাওয়া যায় এবং আমাদের শারীরিক সক্ষমতাও বাড়ে; যা আমাদের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক সুখবোধের অন্যতম উৎস।

তাই চলো প্রতিজ্ঞা করি—

কাজে আমি দিই না ফাঁকি

সবার ভালো মাথায় রাখি।

দৃশ্যপট ১: খাবার কথন

রুনু ও রাজু খেতে বসেছে। রাজু বাটি থেকে বেশির ভাগ খাবার নিজের প্লেটে তুলে নিয়ে গপাগপ খেতে শুরু করল। হঠাৎ তার গলায় খাবার আটকে যাওয়ায় সে কাশতে শুরু করল। সামনে পানি না থাকায় রুনু দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে মগে করে পানি এনে রাজুকে দিল। পানির মগটি রাজু এঁটো হাতেই ধরল। রুনু একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'মগটা নোংরা করেছো, মা-বাবা কেউ বাড়িতে নেই, খাওয়ার পর তোমাকেই ধুতে হবে কিন্তু'!

উত্তর না দিয়ে রাজু মোবাইল ফোন টিপতে টিপতে খেতে থাকল; ফলে প্লেটের চারপাশে খাবার পড়ে জায়গাটাও নোংরা হয়ে গেল। প্লেটের সবটুকু খাবার শেষ না করেই রাজু উঠে গেল। কিছুই পরিচ্ছন্ন করল না। রুনু খেতে বসে দেখল বাটিতে খুব বেশি খাবার নেই; রুনুর ভীষণ মন খারাপ হলো; সে অল্প একটু খেয়ে উঠল। মা-বাবার কষ্ট হবে ভেবে সে সব পরিষ্কার করতে গেল। কিন্তু ওর খুব রাগ হলো কারণ, রাজুর প্লেট পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখল, ওখানে ওর প্রিয় মাছের টুকরাটা অর্ধেক খাওয়া অবস্থায় পড়ে আছে। সব মিলিয়ে রুনুর দিনটা আজ খুব খারাপ। রুনু মনে মনে ঠিক করল, যেভাবেই হোক রাজুকে ভালো কাজগুলো শেখাতেই হবে।

তুমি যদি রাজু হতে তাহলে কী করতে?

রুনু কীভাবে রাজুকে খাবারের আদব-কায়দা শেখাতে পারে, পরামর্শ দাও।

চিত্র ১.৪: খাবার গ্রহণের আদব কায়দা

খাবার গ্রহণের সময় যা যা মেনে চলব

- খাবারের আগে ভালো করে হাত ধুয়ে নেবো।
- খাবার যেমনই হোক আগ্রহ নিয়ে খাব।
- এঁটো হাতে খাবার প্লেটে তুলব না অথবা জগ/মগ/চামচ ধরব না।
- উচ্ছিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট পাত্রে (বোন প্লেট) ফেলব।
- অতিরিক্ত খাবার প্লেটে নিয়ে খাবার নষ্ট করব না।
- খাবার ধীরে-সুস্থে ভালোভাবে চিবিয়ে খাব এবং চিবানোর সময় বিরক্তিকর শব্দ করব না।
- খাবারের সময় প্লেটের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলব না।
- খাবারের মাঝখানে হাঁচি/কাশি আসলে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নেবো।
- খাবারের সময় টিভি/মোবাইল/গেম/গ্যাজেটে মগ্ন থাকব না।
- দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকা খাদ্যকণা বের করতে টুথপিক/সুতা ব্যবহার করব এবং এই কাজটি হাত দিয়ে মুখ আড়াল করে করব।
- খাওয়ার পর নিজের প্লেট, মগ ধুয়ে নির্দিষ্ট স্থানে রাখব/রাখার ব্যবস্থা করব।
- খাবার শেষ করে সাথে সাথে শুয়ে পড়ব না অর্থাৎ খাওয়ার কমপক্ষে দুই ঘণ্টা পর ঘুমাতে যাব।

দৃশ্যপট ২ : রিনা ও সুমনের দিনকাল

চিত্র ১.৫: আমাদের ঘর আমরা গোছাই

প্রতিদিন সকালে রিনাদের বাড়িতে খুব হৈচৈ হয়। সকালে রিনা ও সুমন তাদের বিছানা গোছায় না, কাপড়চোপড় কোথায় রাখে তার কোনো ঠিক ঠিকানা থাকে না। স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরে প্রায়ই তারা জুতা একেকটা একেক দিকে ছুড়ে মারে। মোজা রাখে আরেক জায়গায়। এ জন্যে রোজই দেখা যায়, স্কুলে যাওয়ার সময় কারও একটা মোজা পাওয়া যাচ্ছে না, কখনো-বা অনেক খোঁজাখুঁজির পর প্যান্টটা পাওয়া যায় টেবিলের তলায়!

সুমনের একপাটি জুতা গতকাল স্কুলে যাওয়ার সময় খুঁজে না পাওয়ায় সে বাসার স্যান্ডেল পরেই স্কুলে গেল। আর তা দেখে ওর বন্ধুরা ওকে নিয়ে অনেক হাসাহাসি করল। নিয়ম ভঙ্গ করায় ওদের ক্লাস টিচারও ওকে ডেকে বেশ বকুনি দিলেন। সেদিন একটা বিয়ের দাওয়াতে যাওয়ার সময় রিনার বাইরে যাওয়ার জামা পাওয়া গেল দলা পাকানো অবস্থায়; ইস্ত্রিটা নষ্ট থাকায় আয়রন করাও সম্ভব হলো না। ফলে ওর বাবা ওকে দাওয়াতে নিতেই পারলেন না। সারাটাদিন এজন্যে তার খুব মন খারাপ ছিল।

সুমন ও রিনার জন্য
তোমাদের সুপারিশ কী?

দৃশ্যপট ২ : পরিপাটিভাবে বিছানা গোছানো

ঘরের সৌন্দর্য অনেকখানিই নির্ভর করে বিছানার ওপর। ঘরের ঢুকে গোছানো একটি বিছানা দেখলে চোখে প্রশান্তি ভাব আসে, মন জুড়িয়ে যায়, পাশাপাশি ক্লান্তিভাবও অনেকখানি দূর হয়ে যায়। এজন্য সকালে ঘুম থেকে অন্যান্য কাজ শুরু করার আগেই নিজের বিছানাটা নিজে গোছাতে হবে। এতে মনে এক ধরনের মানসিক তৃপ্তি পাওয়া যায়; মনে হয় দিনের প্রথম কাজটি সুন্দরভাবে শেষ হয়েছে, সুতরাং দিনের বাকিটা সময়ও গোছানোভাবে কাটবে। তবে—

বিছানা গোছানো সময় আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে:

- দিনের শুরুতে ঘুম থেকে উঠে দরজা জানালা খুলে দিয়ে ঘরে আলো-বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা করতে হয়।
- অন্য যেকোনো কাজ শুরুর আগেই বিছানা গোছাতে হয়।
- বিছানা ঝাড়ার সময় নাকে মুখে রুমাল/কাপড়/মাস্ক পরে নেওয়া ভালো, এতে ধূলোবালি থেকে এলার্জিজনিত সমস্যা তৈরি হবে না।

এবার এসো, বিছানা কীভাবে গোছাতে হবে তা জেনে নিই:

প্রথমেই বালিশ সরিয়ে বিছানার চাদরটি ভালোভাবে ঝেড়ে নিতে হয়।

এরপর চাদরটি টান টান করে বিছিয়ে দিতে হয় (ব্রাশ বা বিছানার ঝাড়ু ব্যাবহার করা যেতে পারে)

টান টান করে চাদরের চারপাশটা গুঁজে দেয়া যেতে পারে (এতে বিছানা এলোমেলো কম হবে)

এরপর বালিশগুলো মাথার দিকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে হয়

যত্ন করে বিছানা সাজানো-গোছানো এবং নিয়মিত বিছানা প্রস্তুত করা একটি শৈল্পিক কাজ। সারাদিনের ব্যস্ততার শেষে মানুষ নিজেকে সঁপে দেয় বিছানায়। বিছানায় একটু আয়েশ দূর করে শরীর ও মনের ক্লান্তি । তাই আমাদের মন ভালো রাখার জন্য কিংবা সকাল থেকেই মনে প্রশান্তির ভাব আনার জন্য নিজের বিছানাটা সুন্দর করে গুছিয়ে দিনটা শুরু করতে পারি।

কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য সামগ্রী গোছানোর সময় যেদিকে লক্ষ্য রাখবো—

- বাহির থেকে এসে জামা-কাপড় সঙ্গে সঙ্গে ভাঁজ করে রাখা যাবে না অথবা আলমারিতে তুলে রাখা যাবে না; একটু রোদে মেলে দিতে হবে, শুকানোর পর ভাঁজ করতে হবে।
- বাহির থেকে এসে জামা-কাপড় সঙ্গে সঙ্গে ভাঁজ করে রাখা যাবে না অথবা আলমারিতে তুলে রাখা যাবে না; একটু রোদে মেলে দিতে হবে, শুকানোর পর ভাঁজ করতে হবে।
- যেসব পোশাক প্রায় প্রতিদিন বেশি পরিধান করা হয়, গোছানোর সময় সেগুলো সামনে রাখতে হয়; কম পরার পোশাকগুলো আলমারি/বক্স/আলনায় পেছনে রাখলে ভালো হয়।
- মোজা, গেঞ্জি, ইনার এগুলো এক জায়গায় রাখলে সুবিধা হয়।
- স্কুলের পোশাক নির্দিষ্ট জায়গায় রাখলে ভালো হয়; তাহলে স্কুলে যাওয়ার সময় খোঁজাখুজি করতে হয়না।
- কাপড়-চোপড় ময়লা হয়ে গেলে ধোয়ার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় রাখলে ভালো হয়।
- জুতো সবসময় নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে হয়।
- নিজের পড়ার বইখাতা, কলম ইত্যাদি লেখাপড়া শেষে নির্দিষ্ট স্থানে সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখতে হয়।
- নিজের ব্যবহারের অন্যান্য সামগ্রী (যেমন- খেলনা, শখের জিনিস ইত্যাদি) নির্দিষ্ট জায়গায় রাখলে সেগুলো হারানোর ভয় থাকে না।

আগামী সাতদিন তোমার কাজগুলো করেছো কি না তা লক্ষ্য রাখো। সপ্তাহে কতদিন উক্ত কাজটি করেছো তা পূর্বের দুটি ছক থেকে হিসেব করে ছক ১.৪ এর প্রযোজ্য ঘরে টিক চিহ্ন (✓) দাও। (যেমন-নিজের বিছানা যদি সপ্তাহে চারদিন গুছিয়ে থাকো, তাহলে চারদিনের ঘরে এবং যদি ছয়দিন গুছিয়ে থাকো তাহলে ছয়দিনের ঘরে টিক দিতে হবে)। অতিরিক্ত কোনো কাজ করে থাকলে সেগুলো ছকের ১৪ ও ১৫ নম্বরে লেখো এবং সপ্তাহে কতদিন করেছো সেই অনুযায়ী ঘরে টিক দাও। (অতিরিক্ত কাজ হতে পারে মা-বাবার পেশাগত কাজে সহায়তা করা, বাগান/গাছ পরিচর্যা করা, গৃহপালিত প্রাণীর যত্নে সহায়তা করা অথবা অন্য যেকোনো কাজ)। হিসেব করে তোমার সদস্য খেতাব নির্ধারণ করো। তোমার অভিভাবক/পরিবারের যেকোনো বড় সদস্যের কাছ থেকে প্রতি সপ্তাহে মতামত/স্বাক্ষর নিয়ে রাখো। সাত দিন পর পর শিক্ষকের কাছে জমা দাও।

ছক ১.৪: সাপ্তাহিক কাজের অনুশীলন ও প্রতিফলন

ক্রম	কাজের বিবৃতি	সাত দিন (৭)	ছয় দিন (৬)	পাঁচ দিন (৫)	চার দিন (৪)	তিন দিন (৩)	দুই দিন (২)	এক দিন (১)	মোট স্কোর
১	নিজের বিছানা গুছিয়েছি								
২	সময়মতো পড়াশুনা করেছি								
৩	নিজের খাবারের প্লেট, মগ চামচ ধুয়েছি								
৪	পড়ার টেবিল/বই-খাতা-কলম ইত্যাদি গুছিয়েছি								
৫	কাপড়-চোপড়, জুতা-মোজা ইত্যাদি গুছিয়ে								
৬	খাবারের সময় বিশেষ রীতিনীতি মেনে চলেছি								
৭	নিজের পরিচ্ছন্নতার বিষয়গুলো সঙ্গে পালন করেছি								
৮	রান্নার কাজে সহায়তা করেছি								
৯	ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে সহায়তা করেছি								
১০	ছোট/বড় ভাই-বোনের কাজে সহায়তা করেছি								
১১	কাপড় ধোয়ার কাজে সহায়তা করেছি								
১২	ঘর গোছানোর কাজে সাহায্য করেছি								
১৩	বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের (শিশু/অসুস্থ/বৃদ্ধ) সেবাযত্ন করেছি								
১৪									
১৫									
প্রাপ্ত খেতাব:									
অভিভাবকের স্বাক্ষর:									
আমার কথা:									
শিক্ষকের মন্তব্য:									

[এখানে মোট ১৫ ধরনের কাজ X ৭ দিন= ১০৫ স্কোর; অর্থাৎ তোমাদের কেউ যদি ১৫টি কাজই সপ্তাহে ৭দিন করে তাহলে তার স্কোর হবে ১০৫ এবং সে হবে টাইটানিয়াম সদস্য। এভাবে নিজেদের খেতার বের করে নাও]

খেতাব প্রাপ্তি নির্ণায়ক

মোট স্কোর -১০৫

৯৫-১০৫ পেলে -- টাইটানিয়াম সদস্য
৮০-৯৪ পেলে -- প্লাটিনাম সদস্য
৭০-৭৯ পেলে -- গোল্ড সদস্য
৬০-৬৯ পেলে -- সিলভার সদস্য
৪০-৫৯ পেলে -- ব্রোঞ্জ সদস্য
৪০ এর নিচে পেলে -- সাধারণ

আমার বিদ্যালয়, আমার ভালোবাসা

চিত্র ১.৬: একটি বিদ্যালয় ও আমরা

পরিবারের বাইরে আমাদের ভালো লাগার জায়গা হলো বিদ্যালয়। বিদ্যালয়কে ঘিরে থাকে আমাদের যত উচ্ছ্বাস আর আনন্দ। বিদ্যালয়ে কাটানো সময়টুকু আমাদের নির্মল ভালবাসার স্মৃতি হয়ে দোলা দেয় সারা জীবন। বিদ্যালয়ে শিক্ষক আর সহপাঠীদের সঙ্গে গড়ে উঠা বন্ধুত্বের বন্ধন ভীষণ আবেগময়। বিদ্যালয়ের সহপাঠীদের প্রতি আমাদের কী গভীর ভালোবাসার টান! আমরা সবাই চাই বিদ্যালয়ের প্রতি আমাদের এই টান যুগ যুগ ধরে থাকুক, যেন একে পুঁজি করে আমরা আমাদের এই ভালোবাসার প্রতিষ্ঠানকে স্বপ্নের মতো করে সাজিয়ে তুলতে পারি। আর এজন্য প্রয়োজন আমাদের অতি প্রিয় এই বিদ্যালয়ের পরিবেশকে আন্তরিক, আকর্ষনীয় ও সুন্দর করে তোলা। নিজের অতি আপন এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কাজে আমাদের ভালোবাসার চিহ্ন যেন ফুটে ওঠে, সেই চেষ্টা করতে হবে।

আমাদের বিদ্যালয়কে আমরা কেমন দেখতে চাই, তা কল্পনা করে
একটা ছবি আঁকি অথবা গল্প লিখি-

বক্স ১.১: আমার স্বপ্নের বিদ্যালয়

বিদ্যালয়ে আসি, আনন্দে ভাসি

অর্ণবদের ক্লাসে মোট শিক্ষার্থী প্রায় ৫০ জন। পরিচ্ছন্নতা কর্মী ওদের ক্লাস প্রতিদিন পরিষ্কার করার সময় পান না। ফলে প্রায় সময়ই মেঝেটা কাগজের টুকরা, চিপস ও চকলেটের খোসা, ধুলো-বালি ইত্যাদিতে নোংরা হয়ে থাকে। ক্লাসের দেয়ালেও অনেক লেখালেখি, আঁকাআঁকিতে ভর্তি। ওদের ক্লাসে একটা গ্রুপ আছে, ওরা সব সময় পেছনে বসে হৈচৈ করে আর কাজে ফাঁকি দেয়। সারা দিন ক্লাসের অন্যদের পেছনে লেগে থাকা হলো ওদের সবচেয়ে আনন্দের কাজ। ওরা প্রায়ই ক্লাসে একেকজনকে একেকটা করে উদ্ভট নাম দেয় আর সেই নামে ডেকে তাকে খেপায়। সেদিন টিফিনের ফাঁকে সাম্য, সমতা আর খুশি মাঠে গল্প করছিল, হঠাৎ শুনতে পেল,

-এ্যাই ......, এ্যাই ......, এদিকে আয়।

ওরা দেখল দুষ্টগুলোর ডাক শুনে অপু আর শান্ত দৌড়ে নারকেল গাছটার পেছনে নিজেদের আড়াল করল। আর তা দেখে দুষ্টগুলো হো হো করে হাসছে।

সাম্য বলল, এরকম ঘটনা রোজই ঘটে। দ্যাখ, ওরা কী ভীষণ মন খারাপ করেছে!

সমতা বলল, ‘অপুর মা বলেছে, এদের বুলিইং এর ভয়ে বাড়িতে অপু নাকি খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে।’

খুশি বলল, জানিস, ওদের জন্য শান্ত প্রায়ই বাথরুমে ঢুকে কান্না করে। ইস! যদি ওই দুষ্টগুলো ভালো হয়ে যেতো, তাহলে স্কুলে আমাদের সবার কত আনন্দই না হতো!

সাম্য বলল, ‘ওরা নিচের ক্লাসের বাচ্চাদেরও খুব শাসন করে, যখন তখন ধমকায়, এটা সেটা কাজ ধরিয়ে দেয়। অষ্টম শ্রেণির এক আপুর বাবা পাড়ায় পাড়ায় ফেরি করে জিনিসপত্র বিক্রি করে বলে ওকে দেখলেই এরা ‘লেসফিতা আপু’ ডাকে। ওই আপু এ কারণে মন খারাপ করে প্রায়ই স্কুল আসে না। এ সব কিছুর একটা বিহিত করা দরকার। চল, আমরা ওদের সঙ্গে কথা বলে ওদেরকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করি।’

ওরা সবাই তখন দুষ্টগুলোর কাছে এগিয়ে গেল, ওদেরকে বলল, ‘দ্যাখো, বন্ধু, তোমরা যাদের নিয়ে এত হাসছ, ওরা কীভাবে কাঁদছে! আচ্ছা, তোমরাই বলো, এভাবে সবার আনন্দ নষ্ট করে কি নিজে আনন্দ পাওয়া যায়?

দুষ্টগুলো একজন আরেকজনের দিকে তাকাল,

- ‘তা-ই! কাঁদছে? কান্নার কী আছে? আমরা তো মজা করেছি!’

খুশি বললো, ‘কিন্তু দ্যাখো বন্ধু, তোমাদের মজা ওদেরকে অনেক কষ্ট দিচ্ছে!’

সমতা ওদেরকে সব কথা খুলে বলল। সব শুনে দুষ্টরাও মন খারাপ করল। বলল, চল, আমরা ওদেরকে নিয়ে আসি।’ বলতে বলতে সবাই মিলে নারকেল গাছের পেছনে গিয়ে অপু আর শান্তকে ডেকে আনল। ওদের সঙ্গে কাট্টিবাট্টি দিয়ে বলল, ‘এখন থেকে আমরা সবাই বন্ধু। মজা করতে গিয়ে কেউ কাউকে এখন থেকে আর কষ্ট দেব না।’

মুহূর্তেই সবার মন ভালো হয়ে গেল।

সবাই সবার হাত ধরে উঁচুতে তুলে চিৎকার করল, ‘হুররে! কী মজা ! চল সবাই উড়রে!’

ক্লাসের পরিবেশ কীভাবে
আরও সুন্দর ও আনন্দময়
করা যায়?

চলো খুঁজে বের করি

বিদ্যালয়ে আমাদের কাজ ও দায়িত্ব	
নিয়মিত কাজ ও দায়িত্ব	বিশেষ/ আনুষ্ঠানিক কাজ ও দায়িত্ব
■ নিচের ক্লাসের শিক্ষার্থীদের স্নেহ করা/ কাজে সাহায্য করা ■ ওপরের ক্লাসের শিক্ষার্থীদের সম্মান দেখানো ■ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মচারী ও সহপাঠীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা ■ শিক্ষককের কাজে সহায়তা করা ■ কাউকে বুলিইং না করা ■ শ্রেণিকক্ষ পরিচ্ছন্ন রাখা ■ বোর্ড পরিষ্কার করা ■ বেঞ্চ-টেবিল, মেঝে পরিচ্ছন্ন রাখা ও পরিষ্কার করা	■ ল্যাবরেটরি, মাঠ পরিষ্কার করা ■ লাইব্রেরির বই গোছানো ■ বিভিন্ন কাজে শিক্ষককে সাহায্য করা ■ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন- ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাহিত্য/সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিভিন্ন কাজে সহায়তা ■ ক্লাব কার্যক্রম পরিচালনা করা ■ শ্রেণিকক্ষ সাজানো ■ টয়লেট পরিষ্কার করা ■ বাগানে পানি দেওয়া/বেড বানানো/ গাছের পরিচর্যা করা ■ বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা ■ কেউ অসুস্থ হলে তাকে প্রয়োজনীয় সেবা করা

বিদ্যালয়ে আমাদের দায়িত্ব

আমরা দিনের অনেকটা সময় বিদ্যালয়ে কাটাই। তাই এখানে কোনো মনব্যথার ঘটনা ঘটলে তা সারা দিনের কাজের ওপর প্রভাব ফেলে। আমাদের মনোজগতে কষ্টের ছাপ ফেলে। একটি বিদ্যালয়ে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব শুধু শিক্ষকের একার নয়। আমরা প্রত্যেকেই যদি নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করি তাহলে এটিই হতে পারে আমাদের অনেক আনন্দের ঠিকানা। এবার আসো দেখে নিই, বিদ্যালয়ের দায়িত্ব পালনে আমরা কতটুকু সচেতন!

ছক ১.৫: আত্মজিজ্ঞাসা

ক্রম	কাজের বিবৃতি	সবসময় (৫)	বেশিরভাগ সময় (৪)	মাঝে মাঝে (৩)	কদাচিৎ (২)	কখনো না (১)
১	টেবিল, বেঞ্চ পরিচ্ছন্ন করি					
২	শ্রেণির সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করি					
৩	ওয়াশরুম পরিচ্ছন্নভাবে ব্যবহার করি					
৪	ক্লাসে অন্যান্যদেরকে লেখাপড়ায় সহায়তা করি					
৫	বিদ্যালয় পরিচ্ছন্ন রাখার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখি					
৬	ক্লাব কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করি					
৭	শ্রেণির কাজে শিক্ষককে সহায়তা করি					
৮	অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কথা বলি					
৯	যেকোনো সমস্যা/বিষয় যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি					
১০	ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরির কাজে সহায়তা করি					
১১	যেকোনো স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে অগ্রণী থাকি					
১২	বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীদের সহায়তা করি					
১৩	সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলি					
১৪	নির্ধারিত সময়ে অর্পিত কাজ জমা দিই					

প্রাপ্ত স্কোর:

খেতাব:

দলনেতার মতামত/ স্বাক্ষর:

শিক্ষকের মন্তব্য:

খেতাব প্রাপ্তি নির্ণায়ক

মোট স্কোর -৭০

৬০-৭০ পেলে -- টাইটানিয়াম সদস্য
৫০-৫৯ পেলে -- প্লাটিনাম সদস্য
৪০-৪৯ পেলে -- গোল্ড সদস্য
৩০-৩৯ পেলে -- সিলভার সদস্য
৩০ এর নিচে পেলে -- ব্রোঞ্জ সদস্য

আমার বিদ্যালয়, আমার ভালোবাসা দেয়ালিকার জন্য নিজের কথা লেখো।

বক্স ১.২: আমার বিদ্যালয়

আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী

আমরা সবাই আমাদের দেশ ও সমাজকে ভালোবাসি। এই দেশ এবং সমাজকে আমরা কেমন দেখতে চাই তার একটি ছবি আঁকি-

বক্স ১.৩: আমাদের সমাজটা যে রকম দেখতে চাই

শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে সবকটি সূর্যরশ্মি পূরণ করি-

বক্স ১.৪: সমাজের জন্য আমরা যা করতে পারি

সুন্দরভাবে বসবাসের প্রয়োজনেই সমাজের সৃষ্টি। আমরা প্রত্যেকেই সমাজের কোনো না কোনো কাজে লাগতে পারি। এ জন্য আমাদের ইচ্ছাটাই প্রধান। একটা সুখী, সুন্দর সমাজ আমরা সকলে মিলে ইচ্ছে করলেই গড়ে তুলতে পারি। আমরা এখনো অনেক ছোট হলেও সমাজের প্রতি আমাদেরও অনেক দায়িত্ব রয়েছে। এসো, একবার দেখে নিই আমাদের দায়িত্বগুলো-

- সবার সঙ্গে ভালো আচরণ করা
- বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানো
- বয়োকনিষ্ঠদের স্নেহ করা
- গরিব দুঃখীদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করা
- অন্যের বিপদে সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করা
- সব কাজে অন্যের মতামতকে সম্মান জানানো অর্থাৎ গণতান্ত্রিক মনোভাব প্রদর্শন করা
- ট্রাফিক আইন মেনে চলাচল করা
- সবসময় পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়টি মাথায় রেখে কাজ করা

- বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ পরিচালনা/সাহায্য করা যেমন-
    - পরিবেশবিষয়ক সচেতনতা তৈরি
    - পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা/সহায়তা
    - সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনা/সহায়তা
    - রাস্তাঘাট মেরামত বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা/সহায়তা
    - দুর্যোগে সহায়তা (বন্যা, আগুন লাগা, ঝড় ইত্যাদি)
    - যৌতুক, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি বিষয়ক সচেতনতা তৈরি
    - মানব বৈচিত্র্যের প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি/কার্যক্রম পরিচালনা
    - পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়তা
    - শিশু প্রবীণদের সেবামূলক কার্যক্রম
    - স্বাস্থ্য সচেতনতা/টিকা প্রদান ইত্যাদিতে সহায়তা
    - দুর্ঘটনা কবলিতকে সাহায্য করা
    - বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের সহায়তা করা
    - আগে কিছু কাজে এখানে যুক্ত কর ইত্যাদি

সমাজের জন্য তুমি করেছ এমন একটি স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজের অভিজ্ঞতার গল্প লেখ/ছবি আঁক

প্রতিবেশী/ এলাকার কোনো একজন প্রত্যক্ষদর্শীর স্বাক্ষর

বক্স ১.৫: কাজের অভিজ্ঞতা

শিক্ষকের মন্তব্য:

এসো সবাই মিলে গাই, শুনি, অনুভব করি—

আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী
সাথি মোদের ফুলপরী
ফুলপরী লাল পরী লাল পরী নীল পরী
সবার সাথে ভাব করি।
এইখানে মিথ্যে কথা কেউ বলে না
এইখানে অসৎ পথে কেউ চলে না
পড়ার সময় লেখাপড়া
কাজের সময় কাজ করা।
খেলার সময় হলে খেলা করি
আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী।
এখানে মন্দ হতে কেউ পারে না
এখানে হিংসা কভু কেউ করে না।
নেই কোনো দুঃখ অপমান
ছোট বড় সবাই সমান
ভালোবাসা দিয়ে জীবন গড়ি।
আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী
সাথি মোদের ফুলপরী
ফুলপরী লাল পরী লাল পরী নীল পরী
সবার সাথে ভাব করি।

স্বমূল্যায়ন

এই অধ্যায়ে আমরা যা যা করেছি [তোমার পছন্দের ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দাও]

কাজসমূহ	করতে পারিনি ১	আংশিক করেছি ২	ভালোভাবে করেছি ৩
নিজ কাজ শনাক্তকরণ			
পারিবারিক কাজ শনাক্তকরণ			
নিজ কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা প্রণয়ন			
পারিবারিক কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা প্রণয়ন			
পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন			
বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য শনাক্তকরণ			
বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শনাক্তকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে পরিকল্পনা প্রণয়ন			
পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন			
সামাজিক ক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য শনাক্তকরণ			
পরিকল্পনা অনুযায়ী সামাজিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন			
মোট স্কোর: ৩০ তোমার প্রাপ্ত স্কোর:			
শিক্ষকের মন্তব্য:			

তোমার প্রাপ্তি? তুমি যা পেলে তা নিয়ে তোমার মনের অবস্থা চিহ্নিত কর	 একদম ভালো লাগছে না; মনোযোগী হওয়া খুব জরুরি।	 আমার ভালো লাগছে, কিন্তু আমাকে আরও মনোযোগী হতে হবে।	 আমার বেশ ভালো লাগছে, তবে আমাকে আরও ভালো করতে হবে।

... সবসময় সবাই মিলে এমন হাসি হাসতে চাই।।

সুতরাং এভাবে হাসতে হলে এই অধ্যায়ের যেসব বিষয়গুলো আমাকে আরো ভালোভাবে জানতে হবে তা লিখি

যে কাজগুলোর নিয়মিত চর্চা আমাকে চালিয়ে যেতে হবে সেগুলো লিখি

এই অধ্যায় শেষে আমার অর্জন নিয়ে শিক্ষকের মন্তব্য:

পেশার রূপ বদল

তোমরা একটু ভাবো, সেলুনগুলো যদি কখনো চুল কাটা বন্ধ রাখে, তখন আমাদের সবার চুলের কী হাল হবে! চুল যারা কেটে দেন তাদের ছাড়া আমরা খুব অসহায় অনুভব করি, তাই না! ঠিক এরকম যদি প্রতিদিনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী কাজে না আসেন সেক্ষেত্রে আমাদের কী অবস্থা হতে পারে, বলোতো!

পেশার ধারণা

সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে পুনরায় ঘুমাতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সারাদিন আমরা কত ধরনের কাজ করে থাকি, তোমরা তা নিশ্চয়ই জানো। যেমন- শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে, অনেকেই বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা করে দিন কাটিয়ে দেয়, কেউ হয়তো মালামাল এবং যাত্রী পরিবহনের জন্য ট্রাক বা বাস চালান, গ্রামে কৃষক মাঠে ফসল ফলানোর জন্য জমি চাষ করেন, জেলেরা নদীতে মাছ ধরেন, শ্রমিকরা উৎপাদনের জন্য কারখানায় কাজ করেন, শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করেন।

চিত্র ২.১: বিভিন্ন পেশাজীবী

কাজ শব্দটির অর্থ অনেক ব্যাপক। মূলত কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শারীরিক বা মানসিক কর্মকাণ্ডই হচ্ছে কাজ। এই কাজের উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। মানুষ অর্থ উপার্জনের জন্য যে কাজ করে এবং তার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে, তাকে পেশা বলে।

সমাজে প্রত্যেক পেশার মানুষের কাজ বা দায়িত্ব ভিন্ন। কাজের ভিন্নতার জন্য প্রতিটি পেশার শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, যোগ্যতা, দক্ষতা ইত্যাদির মধ্যে ভিন্নতা থাকে। তবে দেশ এবং সমাজের সুষম উন্নয়নে সব পেশার মানুষের অবদান রয়েছে।

সমাজে কোনো পেশার কাজই অপ্রয়োজনীয় বা ছোট বা বড় নয়। মানুষকে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য একজন চিকিৎসকের যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিতকরণের জন্য একজন পরিচ্ছন্নতা কর্মীরও প্রয়োজন আছে।

যেকোনো প্রতিষ্ঠান (যেমন- বিদ্যালয়, হাসপাতাল, ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, কারখানা ইত্যাদি) পরিচালনায় বিভিন্ন পেশার মানুষের প্রয়োজন হয়। চলো, একটি হাসপাতালে কত ধরনের পেশার মানুষ কাজ করে তা খুঁজে বের করি। চিত্রে কয়েকটি পেশার নাম দেওয়া আছে, বাকিগুলো নিজেরা লিখি। হাসপাতাল পরিচালনায় কোন পেশার কী ভূমিকা তা-ও জানার চেষ্টা করি।

চিত্র ২.২: হাসপাতালকেন্দ্রিক পেশাসমূহ

তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছ, হাসপাতাল পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি পেশার মানুষই গুরুত্বপূর্ণ। এদের যেকোনো একটি পেশার অনুপস্থিতি সুষ্ঠুভাবে হাসপাতাল পরিচালনায় ব্যাঘাত ঘটাবে। একেক পেশার মানুষের দায়িত্ব একেক রকমের। ভিন্ন ভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব পালন করে বলেই আমাদের সমাজ এতো সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

এবার, দলগত আলোচনার মাধ্যমে আমাদের এলাকার মানুষের বিভিন্ন পেশার তালিকা তৈরি করি।

বক্স ২.১: আমাদের এলাকার বিভিন্ন পেশার তালিকা

পেশার ধরন পরিবর্তন

দৃশ্যপট - ১

বেশ কিছু দিন আগের কথা। গ্রামের হাটে চম্পার বড় ভাইয়ের একটি ছোট্ট দোকান ছিল। গ্রামের লোকজনের হাতে হাতে তখন মোবাইল ফোন ছিল না। ফোনে কথা বলার জন্য সবাই এই দোকানে লাইন দিত। তারা মোবাইলে এক মিনিট কথা বলার জন্য সাত টাকা করে দিত। রমরমা ব্যবসায় বেশ ভালোই চলছিল চম্পাদের পরিবার। কিন্তু বছর কয়েকের মধ্যেই সবার হাতে হাতে মোবাইল ফোন চলে এলো। তাতে চম্পার ভাইয়ের দোকানের আয় প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। খুব খারাপ অবস্থায় পড়ল চম্পারা। কোনো রকমে তাদের দিন কাটছিল। পাশের বাড়ির সামাদ এ রকম পরিস্থিতিতে চম্পার ভাইকে ইন্টারনেটের কথা বলল। সব শুনে দোকানে সে ইন্টারনেটের ব্যবসা শুরু করল। ধীরে ধীরে আবার তার দোকানে লাইন পড়ে গেল। এখন সে অনলাইন ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে লেনদেনও করে। নতুন ব্যবসায় আবার ঘুরে দাঁড়াল চম্পার পরিবার। সুখের দিন ফিরে এলো তাদের ঘরে।

- দিনবদলের সঙ্গে সঙ্গে চম্পার ভাইয়ের ব্যবসায় কী পরিবর্তন এলো?

- চম্পার ভাই কেন নতুন ব্যবসা শুরু করল?

আগে আমাদের দেশে কী ধরনের পেশা ছিল এবং পেশার মানুষগুলো কীভাবে কাজ করতেন তা নিচের চিত্রগুলো দেখে বোঝার চেষ্টা করি।

চিত্র ২.৩: পেশার পূর্বের রূপ

বিভিন্ন খাতে পেশার কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে এবং নতুন নতুন কী ধরনের পেশা সৃষ্টি হয়েছে তা নিচের চিত্র থেকে বোঝার চেষ্টা করি।

চিত্র ২.৪: পেশার নতুন রূপ

পরিবারে বাবা-মা বা অন্য কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে ২০ বছর আগে বিভিন্ন খাতে পেশার ধরন ও কাজ কেমন ছিল তা নিচের ছকে লিপিবদ্ধ করি।

ছক ২.১: সময়ের সঙ্গে পেশার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ

পেশার ক্ষেত্র	বর্তমানে কেমন	২০ বছর আগে কেমন ছিল	পরিবর্তনের কারণ
শিল্প	ইলেট্রিক বা অটোমেটিক মেশিনে জামাকাপড় সেলাই করা হয়। তেল উৎপাদনের কাজে মেশিন ব্যবহার করা হয়। অ্যালুমিনিয়াম, কাচ ও চীনা মাটি দিয়ে কারখানায় মেশিনে হাঁড়ি-পাতিল, থালা-বাসন তৈরি হয় ।	হাতে ঘোরানো মেশিনে ও সুই-সুতা দিয়ে জামা-কাপড় সেলাই করা হত। তেল উৎপাদনের কাজে ঘানি ব্যবহার করা হতো। কুমার মাটি দিয়ে স্বহস্তে হাঁড়ি-পাতিল, থালা-বাসন তৈরি করতো ।	প্রযুক্তির উন্নয়ন
তথ্য আদান-প্রদান			
কৃষি			
চিকিৎসা			
যাতায়াত			
অন্যান্য			

আগের এবং বর্তমানের পেশার তুলনামূলক চিত্রে আমরা দেখলাম যে আগের অনেক পেশাই বর্তমানে আর নেই এবং অনেক নতুন নতুন পেশার উদ্ভব হয়েছে। এবারে আমরা কোভিড-১৯ মহামারি সময়ের এ-সম্পর্কিত একটি পত্রিকার রির্পোট দেখব। যেখানে দেখানো হয়েছে বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষ প্রযুক্তির সহায়তায় এবং তার উদ্ভাবনী এবং সমস্যা সমাধান দক্ষতা ব্যবহার করে কীভাবে তারা নতুন পেশার সৃষ্টি করছে।

দৃশ্যপট ২

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মেহেদী হাসানকে জুন মাসে অফিস জানিয়ে দেয় নতুন চাকরি খোঁজার জন্য; হঠাৎ মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে কী করবেন তিনি এখন, চল্লিশ বছর বয়সে এসে। এরপরই পরিবারের পরামর্শে যোগাযোগ করেন গ্রামের বন্ধুদের সঙ্গে। কার বাড়ির কোন পণ্য ভালো, খোঁজ নিয়ে খুলে ফেলেন অনলাইনে তরতাজা খাবারের ব্যবসা। শুরুতে যে তিন লাখ টাকা ব্যয় করলেন সেটি তার আগের চাকরি থেকেই উপার্জিত। ধীরে ধীরে তার অনলাইনভিত্তিক খাবারের ব্যবসা বেশ জমে উঠল।

প্রায় চার বছর আগে ভিন্নধর্মী একটি রেস্টুরেন্ট ব্যবসা শুরু করেন সায়েদা রহমান। নয়জন কর্মী নিয়ে আড্ডার মতো একটা জায়গা করে নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে তিনি হাজির হতেন। কিন্তু করোনা ভাইরাসের থাবায় তার রেস্টুরেন্টটি তিন মাস বন্ধ থাকে। এরপর তিনি নিজেই করোনা আক্রান্ত হওয়ায় আর পেরে উঠতে পারছিলেন না। নয় কর্মীকে প্রথম দু'মাস বেতন দিলেও এখন পুরোপুরি বন্ধ সব কার্যক্রম। আইসোলেশনের দিনগুলোতে সারাক্ষণ ভেবেছেন সুস্থ হওয়ার পরে কী করবেন। নিজের গাড়ি না থাকায় তার অ্যাপভিত্তিক চালক স্বামীও বেকার।

কিন্তু সায়েদা রহমান এবং তার স্বামী হাল ছাড়ার লোক নয়। করোনা থেকে সেরে উঠে তারা দুজনে মিলে শুরু করলেন নতুন ব্যবসা।

সূত্র: বাংলা ট্রিবিউন থেকে সংকলিত (২৩/০৭/২০২০)

সায়েদা রহমান নতুন কী কী পেশায় যেতে পারেন, তার জন্য কিছু নতুন আইডিয়া দাও।

পেশার ধরন পরিবর্তনের কারণ

একসময় গ্রামের অধিকাংশ রাস্তা কাঁচা ছিল, ফলে মানুষ হেঁটে বা গরুর গাড়িতে যাতায়াত করত এবং সে সময় গাড়োয়ান (গরুর গাড়ির চালক) নামের একটা পেশা ছিল যা এখন আর নেই। এমনকি গরুর গাড়িও আজকাল প্রায় দেখাই যায় না। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ সড়ক ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। আবার প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে মেশিন বা বৈদ্যুতিক মোটরের সহজলভ্যতার কারণে অনেকেই এখন মেশিন চালিত রিকশা বা ভ্যান চালিয়ে অর্থ উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। এখানে আগের গাড়িয়ান পেশা বিলুপ্ত হয়ে অটো ড্রাইভারের নতুন পেশার সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে আরও অনেক নতুন পেশার সৃষ্টি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এমন অনেক পেশার উদ্ভব হবে যা এখন আমাদের কল্পনারও বাইরে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ও দেশীয় পেশা পরিবর্তিত হয়। কোনো কোনো পেশার পরিবর্তন হয় স্থানীয় ও জাতীয় পরিস্থিতি ও চাহিদা পরিবর্তনের কারণে; যেমন বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ (ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা), স্বল্প উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা, প্রযুক্তির উন্নয়ন, শিল্প-বিপ্লব, ইত্যাদি। তবে পেশার পরিবর্তন যে কারণেই হোক না কেন, আমাদের তার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। চলো নিচের কবিতার লাইন দুটি আমরা সবাই একত্রে আবৃত্তি করি-

সময় বদলায়, সাথে বদলায় পেশা
দিনবদলে মানিয়ে নেয়া হোক সবার প্রত্যাশা

পেশার মৌলিক দক্ষতা

যেকোনো পেশায় কাজ করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু দক্ষতা অর্জন করতে হয়। এগুলোর মধ্যে কিছু দক্ষতা আছে যেগুলো প্রতিটি পেশার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেমন- সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করা, সমস্যার সমাধান করা, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, ফলপ্রসূ যোগাযোগ করা, প্রয়োজনে অভিজ্ঞ/অন্যের সহায়তা নেওয়া, নতুন কিছু তৈরি/উদ্ভাবন করা প্রভৃতি। আবার কিছু দক্ষতা আছে যেগুলো সংশ্লিষ্ট পেশা-সংক্রান্ত, যেগুলো আমাদের আগে থেকেই শিখতে হয়। পেশা শুরু করার আগে সেই দক্ষতাগুলো অর্জন না করলে অনেক পেশা আছে যা শুরুই করা যায় না।

আমার ভালো লাগে এমন একটি স্থানীয় পেশা নির্বাচন করি। স্থানীয় এ পেশায় কাজ করে এমন একজন পেশাজীবীকে খুঁজে বের করি। বাবা-মা অথবা পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ কারও সহায়তা নিয়ে ওই পেশাজীবীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। নিচের ছক অনুযায়ী এ পেশায় কাজ করতে গেলে কী কী মৌলিক বিষয় বা বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে হবে তার একটি তালিকা তৈরি করি।

ছক ২.২: পেশার মৌলিক দক্ষতা অনুসন্ধান

পেশা	অর্জনযোগ্য দক্ষতাসমূহ
পেশার নাম: ____________ ____________ পেশাজীবীর নাম: ____________ ____________ সাক্ষাৎকারের তারিখ: ____________ ____________	মৌলিক বিষয় বা দক্ষতা: ____________ ____________ ____________ বিশেষ বিষয় বা দক্ষতা: ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

কেস ১: সেরা রাঁধুনি রাশিদা খাতুন

চিত্র ২.৫: সেরা রাঁধুনি রাশিদা খাতুন

রাশিদা খাতুনকে কে-না চেনে! রাশিদা খাতুনের রান্না ছাড়া আমাদের এলাকায় কোনো অনুষ্ঠান যেন চিন্তাই করা যায় না। বিয়ের অনুষ্ঠান, বৌভাত, গায়ে হলুদ, বিবাহ বার্ষিকী, সুন্নাতে খাতনা, পূজা-পার্বণ বা অন্য কোনো বড় অনুষ্ঠান রাশিদা বাবুর্চি না হলে কেন যেন অসম্পূর্ণই থেকে যায়। তিনি আমাদের অতি পরিচিত, সবার প্রিয় 'রাশিদা বাবুর্চি'। রাশিদা বাবুর্চির খাবার খেয়ে তার রান্নার প্রশংসা করেনি এমন লোক মনে হয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি আমাদের এলাকায় 'সেরা রাঁধুনী' হিসেবে স্বীকৃত।

রাশিদা বাবুর্চি কীভাবে রান্না শিখল, আমরা কী তা জানি? খাবার এবং রান্নার প্রতি ছোটবেলা থেকেই ছিল তার ব্যাপক আগ্রহ। রাশিদার মা যখন রান্না করত তখন থেকেই তিনি খেয়াল করত মা কীভাবে রান্না করেন? রাশিদার মা-ও ভালো রান্না করতেন। মুলতঃ রাশিদার মায়ের কাছ থেকেই তার রান্নার হাতে খড়ি। রান্না নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে পরীক্ষা করত, নতুন নতুন খাবার তৈরি করতেন, বাড়িতে আর সকলকে খাওয়াতেন। এরপর বড় হয়ে তিনি রান্না শেখার কোর্স করেছিলেন। প্রথমে তিনি অনুরোধে বাড়ির আশে-পাশের ছোট-খাট অনুষ্ঠানে রান্না করত। এরপর ধীরে ধীরে নাম-ডাক ও সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। এখন কয়েক হাজার লোকের অনুষ্ঠানে রান্না তার কাছে কোনো ব্যাপার না। তার রান্নার স্বাদ যেন মুখে লেগে থাকে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রান্নার পাশাপাশি সে হোম-মেইড ফুড ডেলিভারি সার্ভিস চালু করেন। প্রতিদিন প্রায় ৫০ থেকে ১০০ জন লোকের খাবার তৈরি করেন এবং বিভিন্ন বাড়িতে, অনুষ্ঠানে তা সরবরাহ করেন। বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম, দৃঢ় সংকল্প এবং রান্নায় নতুনত্ব এবং গুণগত মানকে বজায় রেখে তিনি তার বাবুর্চির কাজ এবং ফুড ডেলিভারি ব্যবসাকে সাফল্যের দিকে নিয়ে গেছেন।

রাশিদা খাতুন কী কী দক্ষতা অর্জন করেছিলেন? তিনি কীভাবে 'সেরা রাঁধুনী' হয়েছিলেন?

কেস ২ : আমাদের বিধান দর্জি

চিত্র ২.৬: আমাদের বিধান দর্জি

আমাদের এলাকার বিধান ত্রিপুরা একজন নামকরা দর্জি। তিনি 'বিধান ফ্যাশন হাউস ও টেইলার্স' এর মালিক। বিধানের তৈরি জামা-কাপড় আমাদের এলাকায় খুব জনপ্রিয়। অনেকের কাছে তিনি 'বিধান দর্জি' নামে পরিচিত। অনেক কষ্ট করে বিধান আজকের এ অবস্থানে এসেছেন।

বিধানের বয়স যখন ১০ তখন তার বাবা মারা যান। তার মা অনেক কষ্ট করে তাকে এসএসসি পর্যন্ত পড়ান। মা অসুস্থ হয়ে পড়লে বিধানকে সংসারের হাল ধরতে হয়। নিকটবর্তী সরকারি টেকনিক্যাল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট থেকে টেইলরিং এন্ড ড্রেস মেকিং এর উপর বিধান ছয় মাস মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করেন। বাসায় পড়ে থাকা মায়ের হাতের সেলাই মেশিন দিয়েই শুরু করেন তার কাজ। প্রথমে বাড়ির আশে-পাশের মানুষের শার্ট-প্যান্ট ও সালোয়ার-কামিজ বানাতে শুরু করলেন। সেই সাথে দোকান থেকে গজ কাপড় কিনে ছোট বাচ্চাদের জন্য জামা, প্যান্ট, ফতুয়া তৈরি করতেন এবং পার্শ্ববর্তী বাজারে পাইকারী দামে সরবরাহ করতেন। আস্তে আস্তে তিনি ছেলে-মেয়ে, পুরুষ-মহিলা সকলের জন্যই পোশাক বানাতে শুরু করলেন। কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা, মনোযোগ আর নিখুঁত মান বজায় রেখে কাজ করাতে তাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। কাজের অর্ডার অনেক বেড়ে গেলে বিধান ত্রিপুরা বাজারে দোকান নেন। তার দোকানে এখন দশ জন কর্মচারী কাজ করেন। বিধান ত্রিপুরা স্বপ্ন দেখে তিনি ভবিষ্যতে তার এলাকায় একটি ড্রেস মেকিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা এবং এলাকার দুঃস্থ লোকদের কাজ শেখাবেন।

বিধান ত্রিপুরা কী কী দক্ষতা অর্জন করেছিলেন? তিনি কীভাবে 'বিধান দর্জি' হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন?

কেস ৩: প্রযুক্তির আলোয় দৃষ্টিজয়ী ভাস্কর

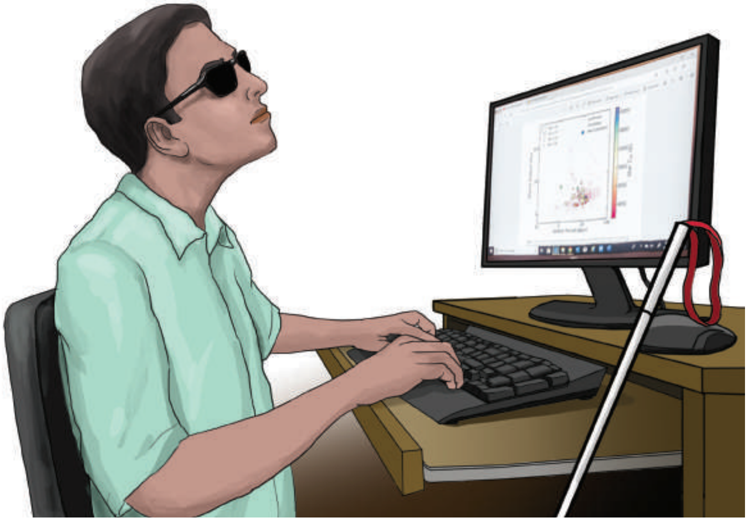

চিত্র ২.৭: ভাস্কর ভট্টাচার্যের ডিজিটাল কর্মজগৎ

প্রতিবন্ধী মানুষের সহজ চলাচল, (প্রবেশগম্যতা), তথ্য-প্রযুক্তিতে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ১৫ বছরের অধিক সময় ধরে সফলতার সঙ্গে কাজ করা ব্যক্তির নাম ভাস্কর ভট্টাচার্য্য। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত একটি অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। জন্মের দুই বছরের মাথায় ভাস্কর চোখের দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেন। ভাস্কর অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পাড়ি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাস করেন। এরপর তিনি কম্পিউটার ও তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে দেশে বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

কম্পিউটার এবং তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করে ভাস্কর দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। এর মধ্যে প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সব পাঠ্যপুস্তককে ডিজিটাল টকিং বইয়ে পরিণত করা, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য অ্যাক্সেসেবল ডিকশনারি তৈরি করা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার কারিগরি সহায়তা নিয়ে তিনি বাংলাদেশে প্রথম কম্পিউটারাইজড ব্রেইল প্রোডাকশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের প্রথম ইনক্লুসিভ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিণত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন ভাস্কর। ইতোমধ্যে তিনি তার কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছেন।

ভাস্কর ভট্টাচার্য্য কী কী দক্ষতা অর্জন করেছিলেন? তিনি কীভাবে বিখ্যাত হয়েছিলেন?

দক্ষতা উন্নয়নে কারিগরি ও বৃত্তিমুলক কোর্স

চিত্র ২.৮ : কারিগরি ও বৃত্তিমুলক শিক্ষা

একবিংশ শতাব্দীর চাহিদার আলোকে দেশে-বিদেশে, শিল্পকারখানায় কারিগরি ও দক্ষ জনশক্তির চাহিদা এবং প্রচলিত প্রযুক্তির পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ সরকার কারিগরি ও বৃত্তিমুলক শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন মেয়াদী কোর্স পরিচালনা করছে। কারিগরি ও বৃত্তিমুলক শিক্ষার এই কোর্সগুলো বিভিন্ন বিষয়ের উপর স্বল্পমেয়াদী (তিন মাস থেকে ছয় মাস পর্যন্ত), মধ্যমেয়াদী (ছয় মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত) এবং দীর্ঘমেয়াদী (এক থেকে চার বছর পর্যন্ত) হয়ে থাকে। অষ্টম শ্রেণি পাস করে যেকোনো শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে এবং ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা পূরণ করে কারিগরি ও বৃত্তিমুলক শিক্ষার এই কোর্স সম্পন্ন করে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে। দেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলাতেই সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন মেয়াদে এই কারিগরি ও বৃত্তিমুলক কোর্সগুলো পরিচালনা করে থাকে।

প্রতিটি পেশাই সমাজের এবং দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পর্যাপ্ত কারিগরি ও বৃত্তিমুলক দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং সংকল্পের সঙ্গে যদি কাজ করা যায় তাহলে যেকোনো পেশাই আকর্ষনীয় হতে পারে, পর্যাপ্ত উপার্জনও হতে পারে। আমরা ছোট-বড়, স্থানীয়-বিদেশি প্রতিটি পেশাকেই সমান দৃষ্টিতে দেখব এবং সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের যথাযথ সম্মান দেব।

নিচের ছড়ার লাইনটি আবৃত্তি করি-

পেশা নয় ছোট বড়ো

সব পেশাকেই সম্মান করো।

স্বমূল্যায়ন

এই অধ্যায়ে আমরা যা যা করেছি [তোমার পছন্দের ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দাও]

কাজসমূহ	করতে পারিনি ১	আংশিক করেছি ২	ভালোভাবে করেছি ৩
এলাকার মানুষের বিভিন্ন পেশার তালিকা তৈরি			
সাক্ষৎকার/ আলোচনার মাধ্যমে এলাকার বিভিন্ন পেশাজীবীর সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়			
সময়ের সাথে পেশা পরিবর্তনের ধারা পর্যবেক্ষণ			
প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন পেশাজীবীর কেসস্টাডি পর্যবেক্ষণ			
বিভিন্ন পেশার মৌলিক দক্ষতাসমূহ অন্বেষণ			
স্থানীয় ও দেশীয় পেশার মৌলিক দক্ষতাসমূহের সাথে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার যোগসুত্র স্থাপন			
মোট স্কোর: তোমার প্রাপ্ত স্কোর:			
শিক্ষকের মন্তব্য:			

তোমার প্রাপ্তি? তুমি যা পেলে তা নিয়ে তোমার মনের অবস্থা চিহ্নিত করো	 একদম ভালো লাগছে না; প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আমার জানা খুব জরুরি।	 আমার ভালো লাগছে, কিন্তু প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আমার আরও বিস্তারিত জানা প্রয়োজন।	 আমার বেশ ভালো লাগছে, এগুলো সম্পর্কে আমার জানার চেষ্টা অব্যাহত রাখবো।

... সব সময় সবাই মিলে এমন হাসি হাসতে চাই।।

সুতরাং এভাবে হাসতে হলে এই অধ্যায়ের যেসব বিষয়গুলো আমাকে আরও ভালোভাবে জানতে হবে তা লিখ

উক্ত বিষয়গুলো আমাদের শিক্ষক, সহপাঠী, অভিভাবক, ইন্টারনেট ও এলাকার লোকজনদের নিকট থেকে জেনে নিই।

শিক্ষকের মন্তব্য

আগামীর স্বপ্ন

তোমরা বিশ্বখ্যাত রাইট ব্রাদার্স নামে পরিচিত উইলবার রাইট ও অরভিল রাইট নামের দুই ভাইয়ের কথা শুনেছ নিশ্চয়। এই দুই ভাই ১৯০৩ সালে পৃথিবীর আকাশে প্রথম মানুষ বহনযোগ্য উড়োজাহাজ ওড়ান। মজার বিষয় হলো, এই উড়োজাহাজ বানাতে গিয়ে তারা বিখ্যাত চিত্রকর লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চির বহুকাল (১৪৮৫ সাল) আগে আঁকা ছবি 'অর্নিথপ্টার' (Ornithopter) নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছিলেন। প্রায় ৫০০ বছর আগে ভিঞ্চির কল্পনার পাখার বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন এই দুই প্রকৌশলী। তাই এমন তো হতে পারে, আজ আমরা যা আগামীর বলে স্বপ্ন দেখছি, খুব শিগগির তা হয়ে উঠতে পারে বাস্তব ও বর্তমান। বর্তমানে আমরা এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দ্বার প্রান্তে অবস্থান করছি। এই প্রযুক্তিগত বিপ্লব আমাদের জীবনযাপন পদ্ধতি, আমাদের কাজের পদ্ধতি এবং মানুষের সাথে মানুষের যোগাযোগের উপায়কে ভীষণভাবে প্রভাবিত করবে।

ভাবতে অবাক লাগে, কিছুদিন আগেও আমরা থ্রিডি প্রিন্টারের কথা কল্পনায় দেখতাম। কিন্তু এখন সেটা আমাদের সামনেই উপস্থিত। রোবটের নানা কাহিনি তো আমাদের অতীত কল্পনাকেও হার মানাতে যাচ্ছে। আরও কত কী যে আসবে ক'দিন পর! মানুষের জায়গায় রাজত্ব করবে মানুষের হাতে তৈরি রোবট! কারও চাকুরি থাকবে, কারো থাকবে না। ভবিষ্যৎ দুনিয়ায় নিজের জায়গা করে নিতে হলে লাগবে অনেক বুদ্ধি, অনেক দক্ষতা আর নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সক্ষমতা। ভিঞ্চি শত শত বছর আগে তাঁর কল্পনায় উড়ার ছবিতে ভরিয়ে তুলেছিলেন The codex on th flight of bird নামের খাতা। উড্ডয়ন সম্পর্কিত এমন দূরদর্শী চিন্তাভাবনা অন্যদের দিয়েছে স্বপ্ন জোড়ার কাঁচামাল। আমাদেরও অজানা ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে দূরদর্শী ও বিচক্ষণ হতে হবে। এসো, আমরা এবার কিছু নতুন বিস্ময়ের সঙ্গে পরিচিত হই।

নিচের ছবি দেখে যে শব্দ বা শব্দগুলো বা বাক্য প্রথমেই মনে পড়ে, তা ছবির পাশে লিখি-

চিত্র ৩.১.১

চিত্র ৩.১.২

চিত্র ৩.১.৩

চিত্র ৩.১.৪

চিত্র ৩.১.৫

চিত্র ৩.১.৬

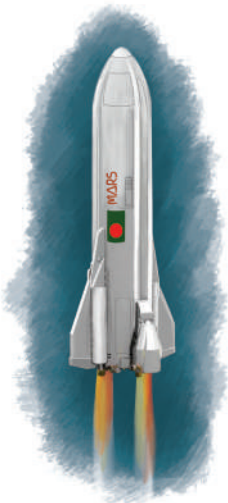

চিত্র ৩.১.৭

চিত্র ৩.১.৮

কোন ছবিটি তোমার কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর মনে হচ্ছে? ছবিটি সম্পর্কে তোমার অনুভূতি লেখ।

বক্স ৩.১: আমার বিস্ময়

ভবিষ্যতের গল্প

২০৬২ এর এক দিন

ইলমা ঘুমানোর আগেই ঠিক করে নিলো যে আগামীকাল সে কোনোভাবেই স্কুলে যেতে দেরি করবে না; কাল বেশ মজার একটা ক্লাস হওয়ার কথা। ইলমা ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে; আগামীকাল হলো ২৭ আগস্ট, ২০৬২।

ঠিক সকাল সাতটায় তার অ্যালার্মওয়ালা বালিশ আস্তে আস্তে নড়া শুরু করল। ইলমা চট করেই উঠে পরল; হাতের ইশারায় ঘরের পর্দা নিজে নিজেই খুলে গেল; বিছানাও নিজে নিজে গুছিয়ে গেল। বাইরের আবহাওয়া চমৎকার, নীল আকাশ, খুব একটা গরমও না, হাল্কা হাল্কা বাতাস, বাইরের দৃশ্য একদম সবুজ, গোল গোল বাড়ি, কিছু উড়ন্ত গাড়িও দেখা যাচ্ছে। উড়ন্ত গাড়ী হওয়ার পর রাস্তার কোনো দরকার ছিল না বলে ইলমার মনে পড়ল; এই জন্য আজকাল সব সবুজই হয়ে থাকে।

চিত্র ৩.২: ইলমাদের বাসা !

ইলমা বাথরুমে গিয়ে আয়নার স্ক্রিনের সামনে ইশারা দিল এবং টিপ দিয়ে ঠিক করল আজ কোন ধরনের টুথপেস্ট ব্যবহার করবে; আপনা আপনি এক চিকন কল দিয়ে টুথপেস্ট বের হয়ে আসল টুথব্রাশের ওপর। দাঁত ব্রাশ করতে করতে আয়নায় দেখে নিল আজকের দিনের রুটিন কী। গত রাতে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলো থ্রিডি মাইক্রোওয়েবে কী কি নাস্তা তৈরি হবে; টেবিলে গিয়ে দেখে তাদের অনেক দিনের বিশ্বস্ত রোবট, তাঁরা ৩.০, নাস্তা সাজিয়ে রেখেছে।রোবট তাঁরা ৩.০ বলল, “ইলমা, সকাল থেকেই তোমার শিক্ষা ড্রোন, বল্টু ৫.১, রোদে চার্জ নিচ্ছিল; বল্টু এখন প্রস্তুত।”
ইলমা বলল, “ঠিক আছে, নাশতা খেয়েই বের হচ্ছি।”

"আজ তোমার সেই ইন্টারপ্ল্যানেটোরি ক্লাস না?" মা খাওয়ার টেবিলেই দৈনিক অগমেন্টেড খবর দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল ইলমাকে। খবরের বিভিন্ন চরিত্র হলোগ্রাফিকভাবে টেবিলের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বাবা আরও জানাল, "আজ সকালের খবরেও এই নতুন ক্লাসের কথা বলা হয়েছে। সাবধান থেকো কিন্তু নতুন প্রযুক্তি যেহেতু!"

মা তখন বললেন, 'কী আর হবে? এই প্রযুক্তি নিয়ে তো আমরা বেশ কয়েকবার পরীক্ষা করে ফেলেছি'। মা আসলে আন্তঃগ্রহ সম্পর্কের বিশেষজ্ঞ, তিনি দুই গ্রহের মধ্যে যা যা হচ্ছে উন্নয়ন, প্রযুক্তি, ব্যবসাবাণিজ্য, রাজনীতি, ইত্যাদি খেয়াল রাখেন। তবে বাবা আবার মঙ্গল গ্রহের গণস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করেন।

বাবা বললেন, 'তা হোক, কিন্তু স্কুলে তো এই প্রথম। ইলমা, কয়েক মাস আগে তো আমরা ঘুরে এলাম, খেয়াল রেখো যে মঙ্গল গ্রহের যেদিকে তোমরা নামবে, ওখানে শীত পড়ে গেছে। শীতের কাপড় নিয়েছ তো?'

ইলমা বললো, 'বাবা, আমি তো আমার ছয় ঋতুর ডিজিটাল কাপড় পরে আছি। তাপ অনুযায়ী কাপড়ের ধরন বদলায়। দরকার হলে ওখানে গিয়ে আরেকটা কিনে ফেলব, ওখানে তো জিনিসপত্রের দাম এখনও কম।'

চিত্র ৩.৩: বল্টুর সাথে ইলমা!

তাঁরা ৩.০ তখন তাদের জানালো, 'ইলমা, তোমার উড়ন্ত বাসের স্কুল চলে আসবে পনেরো মিনিটে'।

আরেকটু খেয়ে ইলমা বেরিয়ে পড়ল বাসের উদ্দেশে। তার উপরে উপরে বল্টু ৫.১ তার সঙ্গে সঙ্গে এগোতে থাকল। বল্টু এমনিতে খুব একটা বড় না; ইলমার দুই মুঠোর সমান, কিন্তু ইলমা যেখানেই যায় সেখানেই সে উড়তে থাকে।

ইলমা তার শিক্ষা ড্রোনকে জিজ্ঞেস করল, 'বল্টু বল তো, আজকে আমাদের কী নিয়ে ক্লাস হবে এবং কী বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে বলেছিল?'

বল্টুর থেকে প্রজেক্টরের মতন আলো বের হলো। এখন মাটির দিকে আলো, বললেই সে যে কোনো জায়গাতেই আলো দিতে পারে। ইলমা পড়ে বুঝল যে, আজ তাদের মঙ্গল গ্রহের মানুষের বিভিন্ন পেশা নিয়ে অনুসন্ধান করতে হবে।

বাসে বসে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে একটু কথা বলে ইলমা তার ডান হাতের মুঠো খুলে বাম হাত দিয়ে ইশারা করে রাশেদকে কল দিল। রাশেদের হলোগ্রাফিক চিত্র ইলমার মুঠোর ওপর চলে এল। রাশেদ তার উড়ন্ত হুইল চেয়ারে।

'রাশেদ, তুমি প্রস্তুত?'

'হ্যাঁ, ইলমা, বাসে বসে মঙ্গল গ্রহ নিয়ে আমাদের ম্যাডামের বক্তব্য শুনছি। কেমন লাগছে তোমার?'

'এইতো, ভাবতেই একটু ভয় লাগছে যে এই কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশন কীভাবে কাজ করবে। আমরা এক দিকে পৃথিবীতে নাই হয়ে যাব আর অন্য দিকে মঙ্গল গ্রহে ফুটে বের হবো?"

'তাই তো, বক্তব্য শুনে যা বুঝলাম, তুমি টেরই পাবে না'।

চিত্র ৩.৩: মঙ্গল ভ্রমণের পথে!

'ঠিক আছে, রাশেদ, তুমি তাহলে বক্তব্য শুনতে থাকো। আমি বরং আমাদের প্রজেক্টের কাজ একটু এগিয়ে রাখি; মঙ্গল গ্রহের পেশা আর পৃথিবীর কিছু পেশা নিয়ে একটা তালিকা বানিয়ে ফেলি '।

রাশেদের হলোগ্রাম মুঠো থেকে চলে গেল। বল্টুকে ইশারা দিয়েই ইলমা কাজ করতে থাকল দলের গবেষণার বিষয় নিয়ে। বাসে যেতে যেতেই ইলমা দেখল, জানালার বাইরে বিভিন্ন রোবট ও মানুষ বিভিন্ন রকমের কাজ করছে। মানুষের কাজ দেখে তাদের পেশা অনুমান করতে পারছে।

'বল্টু, বাইরের দৃশ্য সমানে স্ক্যান করতে থাকো তো, আর আমাকে বলো, কী কী পেশার মানুষ তুমি দেখতে পারছ।'

শিক্ষা ড্রোন তার আলো তখন ইলমার সামনের সিটের পিছনে ছুড়ে মারলো এবং ইলমা দেখল যে বল্টু তাৎক্ষণিকভাবেই ১৪টি পেশার তালিকা তৈরি করে ফেলেছে। জানালার বাইরে তাকিয়ে ইলমা নিশ্চিত করল কয়েকটি পেশা- এলাকার বিভিন্ন পরিচ্ছন্নতা কর্মী রোবট ঠিক করে দেওয়ার জন্য দুই তিন জন পরিচ্ছন্নতা রোবট শিল্পী, পুলিশ টাওয়ার থেকে এলাকার বিভিন্ন পুলিশ রোবটের কাজ তদারক করছে একজন, কন্ট্রোল টাওয়ারে বসে 'ঢাকা টু মঙ্গল' বাসের যাতায়াত মনিটর করছেন বাসের সুপারভাইজার ইত্যাদি।

বাস উড়তে উড়তে পৌঁছাল এক সবুজ মাঠের ওপরে। মাঠের মাঝখানে তিনটি বড় বড় গর্ত; গর্তের চারপাশে বাসের ভিড়, এর ভেতর দিয়েই বাসসহ সবাই যাবে মঙ্গল গ্রহে।

ক) গল্পটি কেমন লাগল?
খ) গল্পটি কি সম্ভব না অসম্ভব?
গ) গল্পের সবচেয়ে বেশি বিস্ময়কর অংশ কোনটি?

তোমার এলাকা এখন যেমন আছে, ৪০ বছর পরেও নিশ্চয়ই সেরকম থাকবে না। অনেক কিছুই বদলে যাবে। হয়তো অনেক কিছুই যন্ত্রের দখলে চলে যেতে পারে। অথবা এমনটি না-ও হতে পারে।

৪০ বছর পরে তোমার এলাকার প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ কী তা নিয়ে একটি গল্প লেখ বা ছবি আঁকো।

এলাকার ঠিকানা : ---------------------------
সাল : ----------------------------

বক্স ৩.২: আমাদের এলাকার ৪০ বছর পরের চিত্র

ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি ও পেশা

চিত্র ৩.৪.১

মানুষের মতো দেখতে যে রোবট

এটি দেখতে মানুষের মতো মনে হলেও আসলে একটি রোবট। এরা কথা বলতে পারে, নাচতে পারে, অভিব্যক্তিও দিতে পারে। দেখতে পুরোপুরি মানুষের মতন, কিন্তু মানুষ না। তবে, মানুষের মতন চিন্তা করতে পারে তার উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে। তবে এই ধরনের রোবট কোন কোন কাজ করবে তা সাধারণত মানুষই প্রোগ্রাম করে ঠিক করে দেয়।

চিত্র ৩.৪.২

থ্রিডি প্রিন্টার

কম্পিউটারের প্রিন্টার যেমন কমান্ড পেলে লেখা বা ছবি প্রিন্ট করে দেয়; তেমনি থ্রিডি প্রিণ্টার বস্তু প্রিন্ট করে দিবে। ধরো, তোমার একটা মগ লাগবে; তুমি সেটির ডিজাইন এবং কী দিয়ে বানাতে চাও তা প্রোগ্রাম করে কমান্ড দিলে, ব্যস! মগটি প্রিন্ট হয়ে আসবে অর্থাৎ পুরো মগটি তৈরি হয়ে বের হয়ে আসবে। কোনো বস্তুর ত্রিমাত্রিক মডেল তৈরির এই প্রযুক্তিই হলো থ্রিডি প্রিন্টার।

চিত্র ৩.৪.৩

ভয়েস টেকনোলজি

ভয়েস রিকগনিশন বলতে একটি নির্দিষ্ট ডিভাইসের কথ্য নির্দেশাবলী গ্রহণ এবং ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা বোঝায়। সহজভাবে বললে, ভয়েস রিকগনিশন প্রযুক্তি মানুষের আদেশে যোগাযোগ করতে এবং প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। ফোনে ভয়েস প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যবহারকারীর কণ্ঠস্বর চিনতে পারে এবং এভাবে ফোনকে বিভিন্ন কাজ করতে বলতে পারে।

চিত্র ৩.৪: উদীয়মান প্রযুক্তি

চিত্র ৩.৪.৪

বায়োম্যাট্রিকস

বন্ধ দরজা খুলতে চাও? তুমি গিয়ে দাঁড়িয়েছো, খুলবে না, কিন্তু বাড়ির মালিক এসে দাঁড়ানো মাত্র খুলে গেল! এই প্রযুক্তি তার প্রোগামে দেয়া তথ্য থেকে আসল ব্যক্তিকে চিনে নেয়। নিরাপত্তা, উপস্থিতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে বায়োম্যাট্রিকস প্রযুক্তি মানুষের শরীরের নির্দিষ্ট অংশ (যেমন আঙুলের ছাপ, চেহারা, চোখ ইত্যাদি) স্ক্যান করে মানুষকে চিহ্নিত করতে পারে।

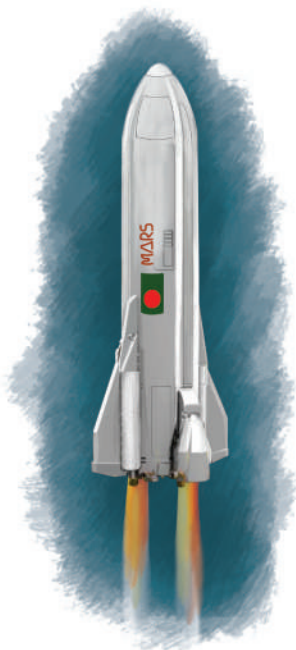

চিত্র ৩.৪.৫

মঙ্গল এক্সপ্রেস

ভবিষ্যতে হয়তো মঙ্গল গ্রহে মানুষের বসতি তৈরি হবে। তখন মঙ্গল এক্সপ্রেসের মাধ্যমে মানুষ পৃথিবী থেকে মঙ্গল গ্রহে নিয়মিত যাতায়াত করতে পারবে।

উপরের যে প্রযুক্তি সম্পর্কে তোমরা কিছুটা জেনেছ, কিছুদিন আগেও এই প্রযুক্তি ছিল স্বপ্নের মতো। বর্তমানে এসব প্রযুক্তি বাস্তবে রূপ নেওয়া শুরু করেছে। এই ধরনের প্রযুক্তি যখন বাস্তবে সাধারণ মানুষের আওতায় চলে আসবে তা আমাদের ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবন ও পেশাগত জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আনবে। এমন একটি প্রযুক্তি হলো চালকবিহীন গাড়ী। চালকবিহীন গাড়ী যখন পুরোপুরি চালু হবে, তখন কী হতে পারে, চলো একবার ভেবে দেখি!

চিত্র ৩.৫: ভবিষ্যৎ চক্র: চালকবিহীন গাড়ি

তোমার ইচ্ছা মতো একটি ভবিষ্যতের প্রযুক্তি বাছাই করে নিজের মতো করে একটি ভবিষ্যৎ চক্র আঁকো।

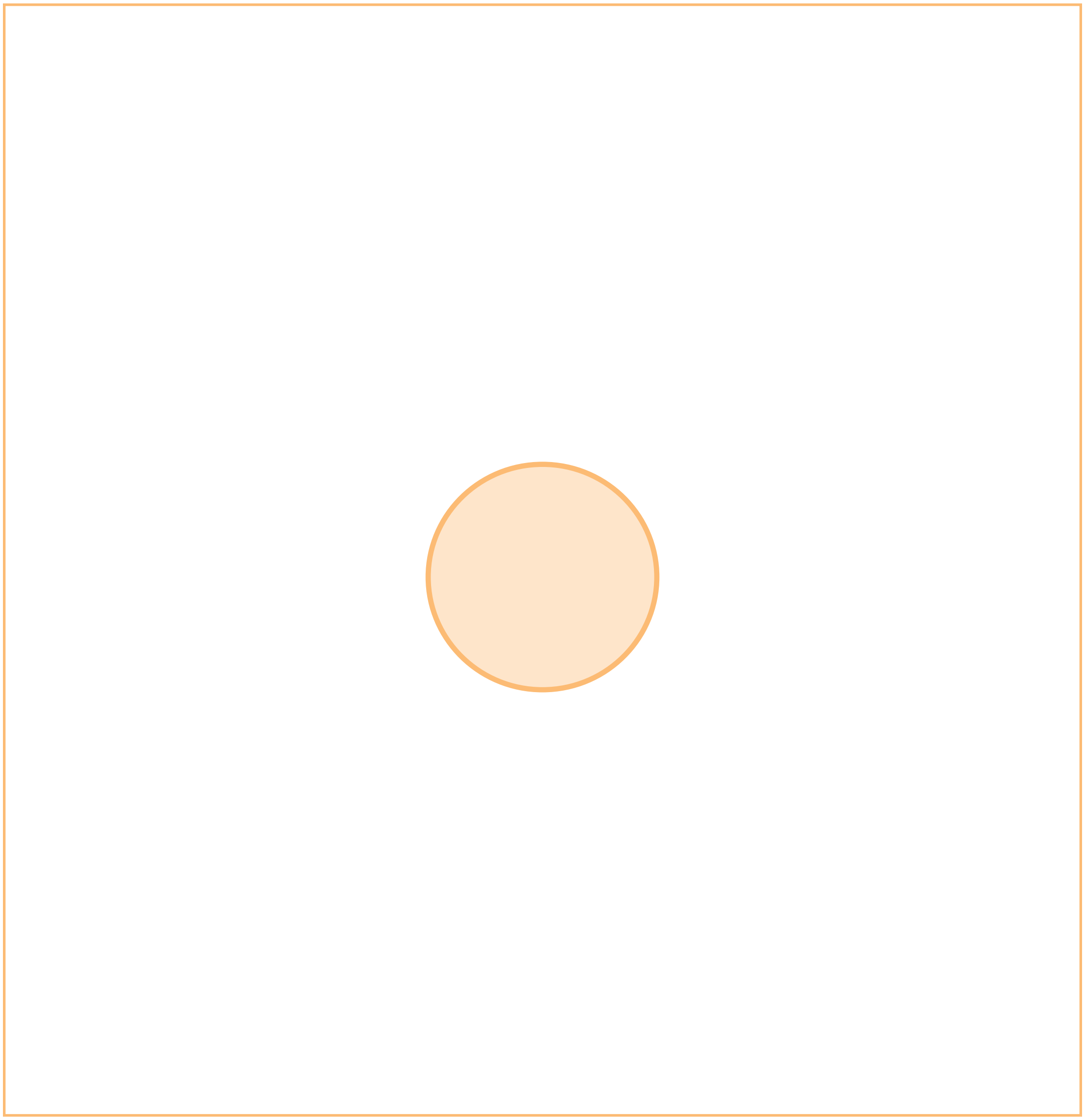

বক্স ৩.৩: ভবিষ্যত চক্র- ....

ভবিষ্যৎ চক্র এঁকে তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছো, নতুন প্রযুক্তি পেশার জগতকে কতখানি বদলে দিচ্ছে, বদলে দিচ্ছে আমাদের দক্ষতার ধরণও। এই বদলে যাওয়া দক্ষতায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করতে হবে; তাতে যেকোনো পরিবর্তনে টিকে থাকা সহজ হবে। ঢেউয়ের সাগরে তীর হারিয়ে ফেললেও আমরা পাড়ি দিতে পারব। তাই চলো, স্বাগত জানাই নতুনকে, আগামীর স্বপ্ন পূরণে নিজেকে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলি আর নতুনকে জয় করার শপথ নিই—

দক্ষ হয়ে নিত্য নতুন প্রযুক্তিতে

করবো জয় বিশ্ব, অবিরাম গতিতে।

স্বমূল্যায়ন

এই অধ্যায়ে আমরা যা যা করেছি [তোমার পছন্দের ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দাও]

কাজসমূহ	করতে পারিনি ১	আংশিক করেছি ২	ভালোভাবে করেছি ৩
প্রযুক্তি নিয়ে লেখা ৪০ বছর পরের নিজ এলাকার ভবিষ্যৎ কল্পনা করে আঁকা বা গল্প তৈরি			
‘২০৬২ এর একদিন’ গল্পটি মনোযোগ দিয়ে পড়া			
ভবিষ্যৎ চক্র আকাঁ			
নাটকে অংশগ্রহণ			
মোট স্কোর: তোমার প্রাপ্ত স্কোর:			
শিক্ষকের মন্তব্য:			

তোমার প্রাপ্তি? তুমি যা পেলে তা নিয়ে তোমার মনের অবস্থা চিহ্নিত কর	 একদম ভালো লাগছে না; প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আমার জানা খুব জরুরি।	 আমার ভালো লাগছে, কিন্তু প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আমার আরও বিস্তারিত জানা প্রয়োজন।	 আমার বেশ ভালো লাগছে, এগুলো সম্পর্কে আমার জানার চেষ্টা অব্যাহত রাখবো।

... সব সময় সবাই মিলে এমন হাসি হাসতে চাই।।

সুতরাং এভাবে হাসতে হলে এই অধ্যায়ের যেসব বিষয়গুলো আমাকে আরও ভালোভাবে জানতে হবে তা লিখ

উক্ত বিষয়গুলো আমাদের শিক্ষক, সহপাঠী, অভিভাবক, ইন্টারনেট ও এলাকার লোকজনদের নিকট থেকে জেনে নিই।

শিক্ষকের মন্তব্য

আর্থিক ভাবনা

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের ছড়াটি তোমাদের মনে আছে তো!

পিপীলিকা, পিপীলিকা
দলবল ছাড়ি একা
কোথা যাও, যাও ভাই বলি।
শীতের সঞ্চয় চাই
খাদ্য খুঁজিতেছি তাই
ছয় পায়ে পিলপিল চলি।

তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ, পিপীলিকা ছয় পা দিয়ে খাবারের সন্ধানে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। কী যে পরিশ্রম করে তারা খাবার মুখে করে বয়ে নিয়ে যায় নিজের ঠিকানায়! দীর্ঘ ছয় মাস ধরে তারা এ কাজ করতে থাকে আগামী ছয় মাসের খাবার জোগাড় করার জন্য। কী কষ্টই না পিঁপড়েরা করে একটি নিশ্চিন্ত আগামীর জন্য! এসো, পিঁপড়ে ও ফড়িং নিয়ে ঈশপের একটি গল্প পড়ি–

'গ্রীষ্মের এক চমৎকার দিনে ঘাসফড়িং তার ভায়োলিনটি নিয়ে গান গাইছিল, নাচছিল আর খেলা করছিল মনের আনন্দে। হঠাৎ সে দেখতে পেল একটা পিঁপড়া অনেক কষ্ট করে খাবার বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঘাসফড়িং পিঁপড়াকে বলল, 'এত কষ্ট করছ কেন ভাই? এসো আমরা খেলা করি, গান গাই, নাচি'।

পিঁপড়া বলল, 'আমাকে অবশ্যই এখন শীতের জন্য খাবার সঞ্চয় করে রাখতে হবে। তুমিও সময় নষ্ট না করে খাবার সংগ্রহ করে রাখো বন্ধু!' 'আরে শীতকাল আসতে তো এখনও অনেক দেরি, ওসব নিয়ে চিন্তা করো না'– ঘাসফড়িং হাসতে হাসতে জবাব দিলো। পিঁপড়া কোনো কথা না বলে খাবার নিয়ে তার বাড়ির দিকে রওনা হলো। গ্রীষ্মশেষে শীত এলো জাঁকিয়ে। ক্ষুধায় কাতর ঘাসফড়িং কাঁপতে কাঁপতে পিঁপড়ার বাড়ি এলো। 'আমায় কিছু খেতে দেবে ভাই'– ঘাসফড়িং বলল পিঁপড়াকে। পিঁপড়া বলল, 'অপেক্ষা করো আজ তোমায় দিচ্ছি। তবে কাল থেকে তোমার খাবার কিন্তু তোমাকেই যোগাড় করতে হবে। তুমি যদি সেদিন আমার কথা শুনতে, তাহলে আজ তোমাকে আমার কাছে আসতে হতোনা আর ক্ষুধায় কষ্ট পেতে হতোনা'।

শীতকালে কে ভালোভাবে এবং নিশ্চিন্তে থাকতে পেরেছিল এবং কেন?

গল্পটি থেকে তুমি কী শিখলে?

শিক্ষকের মন্তব্য:

সঞ্চয়

তোমাদের একটু পুরোনোদিনে ফিরিয়ে নিই। এই অঞ্চলে একসময় মায়েরা রান্নার জন্য প্রতিবেলায় যে চালটুকু লাগতো তা হাড়িতে নেয়ার পর সেখান থেকে একমুট চাল আলাদা পাত্রে/কলসে তুলে রাখতেন। এভাবে রোজ রাখতে রাখতে মাসশেষে ঐ পাত্রে অনেকখানি চাল জমে যেত। সেটা হতো তাদের সঞ্চয়। তখনকার দিনে মায়েরা সংসারের অনেক বিপদ পার করতেন এই মুটচালের সঞ্চয় দিয়ে। সঞ্চয়ের কথা বলতে গেলে শুরুতেই আসে আয়ের কথা। মানুষ বিভিন্ন উপায়ে আয় করতে পারে, যেমন– কোনো নির্দিষ্ট কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক হিসেবে, ব্যবসায় বিনিয়োগের মাধ্যমে, কোনো পণ্য বা সেবা উৎপাদন করে এর বিনিময় করে ইত্যাদি। তোমরা কি আয় করো? কি মনে হয় তোমাদের?

চিত্র ৪.১: মাটির ব্যাংকে সঞ্চয়

হ্যাঁ, তোমরাও আয় করো, তবে তোমাদের আয়ের ধরন হয়তো ভিন্ন। এই যেমন ধরো, তোমাদের বৃত্তি/ উপবৃত্তির টাকা, টিফিনের টাকা, ঈদ-পূজায় প্রাপ্ত সেলামি/ প্রণামির টাকা, জন্মদিন বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপহার হিসেবে পাওয়া টাকা ইত্যাদি। আবার, তোমাদের কেউ কেউ নিজেরা বিভিন্ন কাজ করেও অর্থ উপার্জন করতে পারো; যেমন– ইউটিউবে নিজের তৈরি বিভিন্ন সৃজনশীল কনটেন্ট আপলোড করে, জমিতে চাষের কাজে সাহায্য করে, দোকানে কাজ করে, নিজের বানানো মজার খেলনা বিক্রি করে ইত্যাদি উপায়ে অনেকেই টাকা আয় করে থাকো। উপহার হিসেবে বা অন্য কোনো উপায়ে প্রাপ্ত অর্থ হয়তো তোমরা মনের সুখে খরচ বা ব্যয় করে ফেলো। কখনো মজার কোনো খাবার কিনে খাও, কখনো হয়তো খেলনা কিনে খরচ করো কিংবা বেড়াতে যাও ইত্যাদি! এতে তোমাদের হাতে আর কোনো টাকাই অবশিষ্ট থাকে না। যদি কোনো বিশেষ প্রয়োজনে তোমাদের কিছু কিনতে হয়, তাহলে কী করবে বলো তো! আমাদের কিছু প্রয়োজন হলে আমরা সাধারণত মা-বাবা কিংবা ভাই-বোনদের কাছে চেয়ে নিই, কিন্তু ধরো, তোমার নিজের কাছে যদি কিছু টাকা গচ্ছিত থাকে, তাহলে তো তুমি ওই টাকা দিয়েই তোমার প্রয়োজনীয় জিনিসটি কিনতে পারতে, তাই না?

আমরা যখন কোনো প্রয়োজন মেটাতে কিছু কেনাকাটা করি, তখন আমাদের আয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ কমতে থাকে। এভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ে আমরা যে আয় করি তা থেকে ব্যয়ের পর অবশিষ্ট যে অর্থ থাকে, তা-ই সঞ্চয়। অপচয় পরিহার করে, মিতব্যায়ী হয়ে অর্থ সাশ্রয় করাটাও কিন্তু সঞ্চয়ের মধ্যে পড়ে । মনে করো, গত ঈদ বা পূজায় তুমি ১০০ টাকা উপহার পেয়েছ, ওটা তোমার আয়। এখন ওই টাকা থেকে তুমি যদি ৫০ টাকা দিয়ে কোনো খেলনা কিনে থাকো, তারপরও তোমার কাছে ৫০ টাকা জমা থাকছে, এটা হলো তোমার সঞ্চয়। আর যদি পুরো টাকাই খরচ করে ফেলো, তাহলে কিছুই সঞ্চয় থাকল না।

এবারে তোমরা একটু মনে করে দেখো তো, গত এক বছরে তোমাদের কেউ কোনো টাকা আয় করেছ কিনা? যেমন- সেলামি/প্রণামি/উপহার হিসেবে, যাতায়াতের বা টিফিনের খরচ বাবদ, নিজের লাগানো গাছের সবজি বা ফল অথবা নিজের পালিত হাঁস/মুরগির ডিম বিক্রয় ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত আয়। তোমাদের এই আয় করা টাকা তোমরা কীভাবে খরচ বা ব্যয় করেছো? অথবা কত টাকা সঞ্চয় করতে পেরেছো।

বিভিন্ন উপায়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ে আমরা যে আয় করি, তা থেকে ব্যয়ের পর অবশিষ্ট যে অর্থ থাকে, তা-ই সঞ্চয়। প্রতিদিনের কাজকর্মের মধ্য দিয়েও আমরা সঞ্চয়কে বুঝতে পারি। যেমন ধরো, তোমার এলাকাটি পৌরসভার আওতায় পড়েছে। সেখানে প্রতিদিন নিয়ম করে নির্দিষ্ট সময়ে লাইনে পানি সরবরাহ করা হয়। আমরা তখন সারা দিনের জন্য পানি ধরে রাখি। যখন লাইনে পানি থাকে না তখন আমরা সেই জমানো পানি খরচ করি। প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে এভাবে পানি জমিয়ে রাখাই হলো সঞ্চয়। বাড়িতে অপ্রয়োজনে প্রায়ই আমরা বাতি, ফ্যান ও গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখি। অথচ সেগুলো প্রয়োজন শেষ হওয়া মাত্রই বন্ধ করে রাখা উচিত। তাহলে সেটা হবে আমাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদের সঞ্চয়।

আয় (কী বাবদ এবং কত)	ব্যয় (কী বাবদ এবং কত)	সঞ্চয়
১। সেলামি/প্রণামি/উপহার-১০০টাকা (উদাহরণ)	১। খেলনা- ৫০ টাকা (উদাহরণ)	৫০ টাকা (উদাহরণ)
২।		
৩।		
৪।		
মোট আয়	মোট ব্যয়	মোট সঞ্চয়

সব সময় একটা কথা মনে রাখবে, আমাদের আয় ব্যয় যা-ই হোক না কেন, সেটা অবশ্যই বাবা-মা এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের জানাব। আমাদের হাতে কখন, কোথা থেকে কত টাকা এল এবং সেগুলো কীভাবে খরচ করলাম কিংবা জমালাম জমানো বা সঞ্চিত অর্থ কীভাবে খরচ করা বা কাজে লাগানো যায় তা তাদেরকে জানানোর পাশাপাশি তাদের পরামর্শও নিতে পারি। এতে তারাও আমাদের ওপর অনেক খুশি থাকবেন। সুতরাং তাদের না জানিয়ে কোনো কাজ করা একদম ঠিক হবে না। তাদের কাছে আমাদের সব সময় স্বচ্ছ থাকতে হবে।

এবার এসো, আমরা একটু হিসাব-নিকাশ করি। তোমাদের জীবন ও জীবিকা খাতায় নিচের ছকটি এঁকে নাও। ছকে তোমার আয় ও ব্যয় লিখে রাখবে। বাম পাশে অবশ্যই তারিখ লিখবে। এমন হতে পারে, পুরো মাসে কেউ হয়তো এক টাকাও হাতে পেলে না, তা নিয়ে একদম মন খারাপ করবে না। পরের মাসের জন্য অপেক্ষা করো। যখন টাকা হাতে পাবে, তখন লিখবে। মনে রাখবে, খরচের খাত নির্বাচনে প্রয়োজন ও পছন্দ বিবেচনায় রাখতে হবে।

তারিখ	আয়ের খাত	আয়	ব্যয়ের খাত	ব্যয়	উদ্বৃত্ত/ সঞ্চয়
	মোট				

ছক ৪.১ : আর্থিক ডায়েরি

সঞ্চয়ের গুরুত্ব

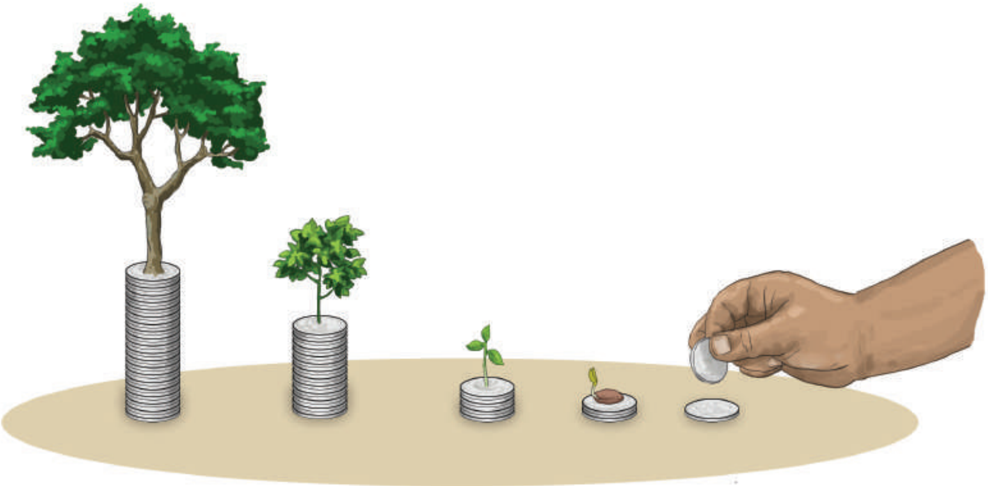

চিত্র ৪.২: ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে একসময় বড় সুযোগ তৈরি হয়

রামুর স্বপ্ন

রামুদের বাড়ি কক্সবাজারের উখিয়ায়। ওর বাবা সাগরে মাছ ধরেন। সেই মাছ বাজারে বিক্রি করে যা টাকা পান, তার সবটুকু দিয়েই তিনি চাল-ডাল ইত্যাদি কেনেন। এভাবেই তাদের খাওয়া-পরা চলে । রামুর খুব শখ স্কুলে যাওয়ার, কিন্তু ওর বাবা ওকে সঙ্গে করে সাগরে নিয়ে যান। বাবাকে সাহায্য করতে গিয়ে রামুও মাঝে মাঝে দু-চারটি মাছ ধরে। ও তার বাবার কাছে আবদার করে বলে, 'এই মাছ ব্যাগগুন কিন্তু আঁর (এই মাছগুলো কিন্তু আমার)।' ওর বাবা হেসে বলেন, 'এই ওগ্‌গা মাছ দিয়েরে তুই কী গরীবি দে (তুই কী করবি এই একটা মাছ দিয়ে)?' রামু মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'কিয়াল্লাই অবাজি, বেচ্চুম আর টিয়া দিয়েরে মজা গরি খাইয়ুম দে (কেন বাবা! বেচব আর টাকা দিয়ে মজা খাবো)!' কিন্তু আসলে রামু একটা টাকাও নষ্ট করে না। ওর ধরা মাছগুলো বাজারে বিক্রি করে টাকাটা সে তার মায়ের হাতে তুলে দেয় জমা রাখার জন্য। এরই মধ্যে একদিন সাগরের ঝড়ের তোড়ে ওদের ঘরের চালা উড়ে যায়। রামুর বাবার তো মাথায় হাত! মাথা গোঁজার ঠাঁই হবে কোথায়! এগিয়ে আসেন রামুর মা। একটু একটু করে এতদিনের জমানো টাকাগুলো বের করে আনেন। টিন কিনে মেরামত করেন তাদের সেই ঘর। রামুর বাবা ভাবেন, কোথা থেকে এল এই টাকা! সব শুনে তিনি রামুর ওপর খুব খুশি হন। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'ও বাপ, তর আজিয়ার তুন আর দরিয়ার যন ন পরিব, তুই এখনত তুন স্কুলত যাবি। আর আই প্রত্যদিন ১০ টিয়া গরি তোর কাছ্‌ত জমা রাখি দিয়ুম বাজান (বাবা, আজ থেকে তোকে আর সাগরে যেতে হবে না, তুই স্কুলে যাবি। আর আমি প্রতিদিন ১০ টাকা করে তোর কাছে জমা রাখব)।'

ক) তোমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে সঞ্চয়ের সুবিধাগুলো উল্লেখ করো।

খ) সঞ্চয় না করলে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে বলে তোমরা মনে করো?

সঞ্চয় বিপদের বন্ধু। দুর্যোগ বা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে, ব্যক্তির আয় বন্ধ হয়ে গেলে বা সম্পদ বিনষ্ট হলে, হঠাৎ করে অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। এ রকম পরিস্থিতিতে এমনকি মৌলিক চাহিদা পূরণ করাও কষ্টকর হয়ে যায়। এ রকম পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সঞ্চয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের বিভিন্ন ইচ্ছা পূরণের জন্যও সঞ্চয় করা প্রয়োজন। মা দিবসে কিংবা বাবা দিবসে অথবা ভাই-বোন, বন্ধুদের জন্মদিনে আমরা বিভিন্ন উপহার দিতে চাই। হতে পারে সেটা নিজ হাতে বানানো কোনো জিনিস কিংবা কিনে দেওয়া কিছু। তবে উপহার বানিয়ে কিংবা কিনে দিতে হলে আমাদের কিছু না কিছু টাকা প্রয়োজন। এই টাকা আমরা সঞ্চয়ের মাধ্যমে পেতে পারি। এ ছাড়া বই, খেলনা বা পছন্দের ব্যাগ ইত্যাদি কিনতে আমাদের সঞ্চয়ের টাকা কাজে লাগাতে পারি। আবার মা-বাবারও অনেক সময় টাকার প্রয়োজন হয়। তখন যদি ছোটরা নিজেদের সঞ্চয় থেকে তাদের সাহায্য করতে পারে, তবে সেটা অনেক সময় যেমন গর্বের হয়, তেমনি মা-বাবার জন্য অনেক উপকার হয়। যেকোনো বয়স থেকেই সঞ্চয় করা যেতে পারে সঞ্চয়ের জন্য মূল বিষয় হলো ইচ্ছে এবং সঞ্চয়ের কৌশল সম্পর্কে অবগত হওয়া এখন থেকেই আমাদের সঞ্চয়ী হতে হবে।

চলো সবাই শপথ নিই–

বিনা কাজে ব্যয় নয়,
তবেই হবে সঞ্চয়।

এসো সঞ্চয় করি

প্রায় শত বছর আগে সঞ্চয় করার একটি সহজ ও ঝামেলাহীন কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন জাপানি এক নারী। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'কাকেইবো'। এর অর্থ হলো পারিবারিক আর্থিক খতিয়ান। কাকেইবোতে হিসাব-নিকাশ রাখা হয় কাগজ-কলমে অর্থাৎ আর্থিক ডায়েরিতে। কাকেইবো অনুসরণে কোনো কিছু কেনার আগে নিজেকে কিছু প্রশ্ন করতে হবে–

- যা কিনতে চাই, তা কেনার মতো টাকা/অর্থ আছে কিনা
- যা কিনব তা আসলেই ব্যবহার করা হবে কিনা
- সেটি এখনই কেনার প্রয়োজন আছে কিনা
- সেটি সত্যিই কাজে লাগবে কিনা
- না কিনলে কোনো ক্ষতি আছে কিনা
- এই মুহূর্তে না কিনলে চলবে কিনা

কোনো কিছু কেনার আগে নিজেকে উপরের প্রশ্নগুলো করলে হয়তো তুমি যা কিনতে চাচ্ছ তা কেনার যৌক্তিক কারণ জানতে পারো অথবা কেনার ইচ্ছা ত্যাগও করতে পারো। ফলে অযৌক্তিক বা অযথা যা ব্যয় করতে যাচ্ছিলে তা পরিণত হবে তোমার সঞ্চয়ে। এ কারণে আমাদের সব সময় কোনটি মৌলিক প্রয়োজন তা ভেবে দেখতে হবে। নিজেদের অযাচিত ইচ্ছা পূরণের জন্য আমরা অনেক সময় নিজেদের কিছু বদ অভ্যাস গড়ে তুলি, যেমন– জাঙ্ক ফুড খাওয়া, রাস্তা থেকে অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া, অপ্রয়োজনীয় কেনা কাটা করা বা সামনে কিছু দেখলেই কেনার জন্য ছটফট করা ইত্যাদি। আবার তোমাদের কারও কারও থাকতে পারে অনেক ধরনের বিলাসিতা, যেমন– ঘন ঘন নতুন জামা-কাপড়-জুতা কেনা কিংবা নানা রকম ভিডিও গেম, বন্ধুদের জন্য দামি গিফট ইত্যাদি কেনা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো নয়। এ জন্য মনে রাখবে–

বদ অভ্যাস : বাদ দাও
বিলাসিতা : কমাও
মৌলিক প্রয়োজনে : খরচ কর

চিত্র ৪.৩: সঞ্চয় সিগন্যাল

যেকোনো বদ অভ্যাস (যেমন-জাঙ্ক ফুড) সবারই স্বাস্থ্য ঝুঁকি আছে, তাই সেসব আমরা বাদ দেবো

বিলাসিতার কোনো শেষ নেই; তাই সেগুলো কমাব

আমাদের মৌলিক প্রয়োজনগুলো আসলে খুবই কম; সেগুলোর জন্য আমরা খরচ করব

আর তাতেই আমাদের সঞ্চয় বাড়বে। হয়তো ২৪ ঘণ্টা পর তোমার চিন্তাটা বদলাতেও পারে। তাই যেকোনো কিছু কেনার আগে দুইবার ভাবতে হবে। অর্থাৎ–

যদি ইচ্ছে হয় কিছু কিনবার
তার আগে ভেবে নিই বার বার।

এবার নিরিবিলি বসে নিজেকে নিয়ে একটু ভাবো। তোমার কোন কাজগুলো করা ঠিক হচ্ছে না, তা নিজেই খুঁজে বের করো। কোনগুলো তোমার জন্য বিলাসী আচরণ তাও ভাবো। এরপর তোমার কোন জিনিসগুলো কেনা প্রয়োজন তার একটি তালিকা বানাও।

শূন্যস্থান পূরণ করো

তোমার কী কী বদঅভ্যাস (যেমন-জাঙ্ক ফুড) আছে, যা বাদ দিতে হবে	তোমার কী কী বিলাসিতা আছে, যা কমাতে হবে	তোমার কী কী প্রয়োজন আছে, যা কিনতে হবে
১।	১।	১। . . . .
২।	২।	২। . . . .
৩।	৩।	৩। . . . .

উপরের ছকটি পূরণ করে এখানে তোমার অভিভাবকের মতামত/স্বাক্ষর নাও

এবার চল, শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ করে আমরা একটা শপিং গেম খেলি।
৪ টি দোকানে আমাদের জন্য জিনিসপত্র (ডামি) সাজানো আছে।

প্রথম দোকান : শৌখিন স্টোর

দ্বিতীয় দোকান : টক ঝাল মিষ্টি

তৃতীয় দোকান : পেপার টু পেনসিল

চতুর্থ দোকান : খেলাঘর

তোমার হাতে ১০০ টাকা (কাগজের) দেওয়া হলো। এবার তোমরা কেনাকাটা করো। সব দোকান থেকেই কিছু না কিছু কিনতে হবে। কত টাকা বাঁচাতে পারলে তা সবাই মিলে দেখব।

(বিক্রেতা যা করবে: তিনজন করে মোট বারজন চার দলে ভাগ হয়ে চার কর্ণারে চলে যাও। প্রতিটি দল শিক্ষকের দেয়া পোস্টার দিয়ে নিজ নিজ স্টল সাজাও। পোস্টারের খালি ঘরে চাইলে অন্য জিনিসের নাম ও ছবি এঁকে নিতে পার। ক্রেতা জিনিস কিনতে আসলে কাগজের টাকা নিয়ে যে জিনিসটি কিনতে চায় তা একটি কাগজের টুকরায় লিখে ক্রেতাকে দাও।

ক্রেতা যা করবে: ক্লাসের বাকীরা সবাই ক্রেতা। তোমরা কাগজের টাকা দিয়ে চার স্টল থেকেই পছন্দ অনুযায়ী কেনাকাটা করো।)

স্কুল ব্যাংকিং

তোমরা এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কীভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় একসময় বড় সঞ্চয়ে পরিণত হয়। আর এই সঞ্চয় তোমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে। তোমাদের সঞ্চয় অনেকেই হয়তো মাটির ব্যাংকে রেখেছ। বিভিন্ন আকারের ও আকৃতির মাটির ব্যাংক অনেক সময় আমরা মেলা থেকে কিনে থাকি। এর মধ্যে আম, গাভি, হাতি এমনকি ডোরাকাটা বাঘের পুতুলকে আমরা পয়সা রাখার মাটির ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করে থাকি। অনেকে আবার বইয়ের পাতায় কিংবা বাঁশের খুঁটির মধ্যেও টাকা এবং কয়েন সংরক্ষণ করে থাকে। একবার ভাবো তো, এভাবে টাকা রাখা কতটা নিরাপদ! এমন হতে পারে, বইটি হারিয়ে গেল কিংবা নাড়াচাড়া করতে গিয়ে কোথায়ও পড়ে গেল! মাটির ব্যাংক হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল অথবা ধরো, বাঁশের খুঁটিতে রাখা টাকা কোনো পোকায় কেটে ফেলল!

আবার এখানে সেখানে টাকা রাখলে, অনেক সময় তোমরা ভুলেও যেতে পারো কোথায় রেখেছ। কিংবা ধরো, জামা বা প্যান্টের পকেটে রেখেছ আর সেটি ধোয়ার সময় ভুলে গেলে! তখন তোমার জমানো টাকার কী হাল হবে বলতো? কিন্তু তোমরা যদি নিরাপদে তোমাদের সঞ্চয়গুলো রাখতে চাও, তাহলে কোথায় রাখা যায় তা একটু ভেবে দেখো তো! এসো, এবার শিক্ষকের দেওয়া নির্দেশনা মোতাবেক কোন ধরনের সংরক্ষণে কী সমস্যা বা সুবিধা তা ভালোভাবে বুঝে ৪.২ ছকটি পূরণ করি।

ছক ৪.২ সঞ্চয় সংরক্ষণের উপায়

সংরক্ষণের ধরন	নিরাপদ কিনা (হ্যাঁ/না)	প্রয়োজনের সময় সহজে পাওয়া যায় কিনা (হ্যাঁ/না)	আয় বা মুনাফা/ লাভ পাওয়া যায় কিনা (হ্যাঁ/না)	অর্থ আদান প্রদানের কোনো প্রমাণ থাকে কিনা (হ্যাঁ/না)
বাড়িতে (বাক্স, মাটির ব্যাংক, ইত্যাদি)				
ব্যাংক				
বাবা-মা পরিবারের বড় কারো কাছে জমা রাখা				

ছক পূরণ করে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ, ব্যাংকে অর্থ জমা রাখাই সবচেয়ে নিরাপদ।

বাড়ির বড়দের মধ্যে কাউকে হয়তো তোমরা ব্যাংকে টাকা রাখতে দেখো, তাই না? তোমরা কি জানো, তোমাদের জন্যও ব্যাংকে টাকা রাখার ব্যবস্থ্যা আছে? ১৮ বছরের কমবয়সী যেকোনো শিক্ষার্থী তাদের মা-বাবা অথবা আইনগত অভিভাবকের সহায়তায় যেকোনো ব্যাংকে হিসাব/অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে। উক্ত অ্যাকাউন্টে সহজেই একজন শিক্ষার্থী তার সঞ্চয়ের অর্থ জমা রাখতে পারবে। মাত্র ১০০ টাকা জমা করেই তোমরা এ সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে পারবে। তোমাদের পক্ষে মা-বাবা অথবা আইনগত অভিভাবক এই হিসাব পরিচালনা করতে পারবেন। তোমাদের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হলে তোমাদের সম্মতিতে এই হিসাব সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাবে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। মজার বিষয় হলো, স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য এই ব্যাংকিং সচল রাখার জন্য কোনো (সরকারি ফি ব্যতীত) প্রকার সার্ভিস চার্জ/ ফি দিতে হয়না এবং আকর্ষণীয় লভ্যাংশ/মুনাফা প্রদান করা হয়। এই হিসাবে তোমরা তোমাদের সঞ্চয়ের অর্থ জমা রাখার পাশাপাশি বৃত্তি/উপবৃত্তির অর্থও সংগ্রহ করতে পারবে। তোমাদের সঙ্গে ব্যাংকের এই হিসাব বা অ্যাকাউন্ট ও লেনদেন ব্যবস্থার নামই হলো স্কুল ব্যাংকিং। স্কুল ব্যাংকিংয়ের সুবিধা অনেক। এসো একনজরে দেখে নিই সুবিধাগুলো–

চিত্র ৪.৪: স্কুল শিক্ষার্থীদের সঞ্চয় !

- জমানো টাকা নিরাপদে থাকবে;
- জমানো টাকার ওপর ব্যাংকের প্রদত্ত আকর্ষণীয় লভ্যাংশ/মুনাফা যোগ হবে;
- এটিএম কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনে যেকোনো স্থানের এটিএম বুথ থেকে টাকা উঠানো যাবে;
- স্কিম ডিপোজিট করে জমানো টাকায় দীর্ঘমেয়াদি ও লাভজনক সঞ্চয় করা যাবে;
- বৃত্তি/উপবৃত্তির টাকা গ্রহণ করা যাবে;
- ঝামেলাহীন উপায়ে স্কুলের বেতন/ফি পরিশোধ করা যাবে;
- শিক্ষা বীমা সুবিধা গ্রহণ করা যাবে;
- প্রয়োজনে ঋণ সুবিধাও গ্রহণ করা যাবে ইত্যাদি।

এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, টাকা জমানোর জন্য কেন স্কুল ব্যাংকিংয়ের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করানো হলো? এবার এসো, ছোট্ট একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান করি–

সত্যের বাবা জনাব সাগর সরকার মাসে ২০,০০০.০০ টাকা করে বেতন পান এবং প্রতিমাসে সংসারে তার ১৮,৫০০.০০ টাকা খরচ হয়। প্রতি মাসে তার সঞ্চয় কত তা হিসাব করে বের করো। কিন্তু তিনি সঞ্চিত অর্থ জমিয়ে না রেখে এটা-সেটা কিনে খরচ করে ফেলেন। তবে তিনি এভাবে সঞ্চিত এক বছরের অর্থ নিকটস্থ ব্যাংকে জমা রাখলে ৭% লভ্যাংশ পেতেন। যদি তাই হয়, সেক্ষেত্রে ৫ বছর পর তার সঞ্চিত অর্থ বৃদ্ধি পেয়ে কত হতো, বলতো? এরকম একটি পরিস্থিতিতে সাগর সরকারের জন্য কিছু পরামর্শ দাও।

তোমার পরামর্শ

এসো কিছু কেনার জন্য একটি আর্থিক পরিকল্পনা করি

কোনো কিছু কিনতে গেলে প্রথমেই আমরা চিন্তা করি কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি কিনতে কত টাকা লাগতে পারে। এরপর চিন্তা করি সেটি কেনার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা আমার নিকট আছে কিনা। যদি না থাকে তাহলে বাড়তি আর কত টাকা কীভাবে সংগ্রহ করতে হবে, সবকিছুরই একটা সম্ভাব্য হিসাব আমরা করে থাকি। এটিই হলো, কিছু কেনার আর্থিক পরিকল্পনা। এখন কথা হলো আর্থিক পরিকল্পনা কেন প্রয়োজন।

এখন থেকেই যদি আমরা আর্থিক পরিকল্পনা করে কাজ করতে শিখি, তবে ভবিষ্যৎ কর্মজীবন ফলপ্রসু ও সুন্দর হতে পারে। এখন আমরা দেখব, কিছু কেনার জন্য আর্থিক পরিকল্পনা কীভাবে করা যেতে পারে, যেমন– ধরো, তোমার অনেক দিনের শখ একটি সুন্দর ক্যারম বোর্ড কেনার। এদিকে বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব প্রায় দুই কিলোমিটার। হেঁটে যেতে বেশ সময় নষ্ট হয়। এবার তুমি হয়তো চিন্তা করে ঠিক করলে, ক্যারমের চেয়ে বেশি প্রয়োজন সাইকেলের। অর্থাৎ তুমি সাইকেল কেনার সিদ্ধান্ত নিলে। এবার তোমাকে সাইকেল কেনার পরিকল্পনা করতে হবে। এ জন্য প্রথমেই দেখতে হবে তোমার কাছে অথবা তোমার স্কুল ব্যাংকিং হিসাবে কত

টাকা সঞ্চিত আছে। সাইকেলটি কিনতে আর কত টাকার প্রয়োজন। বাকি অর্থ তুমি কীভাবে সংগ্রহ করবে তা তোমাকে চিন্তা করতে হবে। এবার তুমি বিভিন্ন উৎসবে বড়রা তোমাকে যে উপহার দেয় কিংবা টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে, রিকশায় না উঠে হেঁটে স্কুলে গিয়ে তুমি অল্প অল্প করে অর্থ সংগ্রহ করতে থাকলে। তোমার সঞ্চিত অর্থ স্কুল ব্যাংকিংয়ের সঞ্চিত হিসাবে জমা করতে থাকলে।

এভাবে সঞ্চিত অর্থ একসময় সাইকেলের মূল্যের সমপরিমাণ হলো। এরপর বাবাকে নিয়ে একদিন ব্যাংকে গেলে এবং সঞ্চিত অর্থ ব্যাংক থেকে তুলে নিয়ে বাজারে গিয়ে তোমার পছন্দের সাইকেলটি কিনলে। এভাবে আর্থিক পরিকল্পনা করে আমরা আমাদের ইচ্ছা বা স্বপ্নগুলোকে বাস্তবে রূপদান করতে পারি। কিছু কেনার আর্থিক পরিকল্পনা করার সময় আমরা কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করতে পারি।

কিছু কেনার জন্য আর্থিক পরিকল্পনার ধাপ

পছন্দগুলো	পছন্দের অগ্রাধিকার	পরিকল্পনা	সঞ্চয়ী হিসাব খোলা	সঞ্চয়	সাইকেল
■ স্মার্টফোন ■ বাইসাইকেল ■ ক্যারম বোর্ড ■ উৎসবের পোশাক	স্কুলে যাতায়াতের জন্য বাইসাইকেল	■ কবে কিনব ■ কত টাকা প্রয়োজন ■ অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমিয়ে সঞ্চয় করতে হবে	■ ব্যাংকে যাই ■ স্কুল ব্যাংকিংয়ে সঞ্চয়ী হিসাব খুলি	■ ব্যাংকে নিয়মিত টাকা জমাই	

অর্থাৎ মূল কথা হলো, আমাদের অনেক ধরনের পছন্দ থাকতে পারে। সেখান থেকে প্রয়োজন বিবেচনা করে যেকোনো একটিকে আমরা বেছে নেব। এরপর সেটির জন্য কত টাকা লাগবে, কবে নাগাদ কিনতে চাই এবং প্রতিমাসে কত টাকা করে জমা করতে হবে তা হিসাব করে বের করব। সেই অনুযায়ী ব্যাংকে টাকা জমাতে থাকব। জমানো টাকার সঙ্গে ব্যাংকের বার্ষিক লভ্যাংশ হিসাবে জমা হয়ে একসময় দেখব আমার কাঙ্ক্ষিত টাকার পরিমাণ জমা হয়ে গেছে। ব্যস, কিনে ফেলব আমার স্বপ্নের জিনিস অথবা দরকারি যেকোনো কাজে টাকাটা কাজে লাগাব।

পোস্টার তৈরি

উদাহরণের ধাপগুলো অনুসরণ করে তোমার প্রয়োজনীয় কোনো কিছু কেনার জন্য একটি আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি করো।

কীভাবে আর্থিক ডায়েরিতে হিসাব রাখতে হয় তা নিশ্চয়ই তোমরা সবাই শিখেছ। এর পাশাপাশি কীভাবে প্রয়োজন বুঝে খরচ করে টাকা জমাতে হয় তাও শিখেছ। কিছু কেনার জন্য কীভাবে আর্থিক পরিকল্পনা করতে হয় , তাও এখন সবাই জানো। তাহলে এবার চলো, আমরা একটি প্রজেক্ট হাতে নিই।

প্রজেক্ট ওয়ার্ক

কর্মসূচির নমুনা

ক) শ্রেণির সবাই মিলে পিকনিক/বনভোজন করা;

খ) সবাই মিলে পাশের কোনো দর্শনীয় স্থানে বেড়াতে যাওয়া;

গ) সবাই মিলে ক্লাসে কোনো অনুষ্ঠান বা উৎসবের আয়োজন করা।

(তোমরা চাইলে তোমাদের পছন্দমতো অন্য যেকোনো অনুষ্ঠান আয়োজনও করতে পারো। নিজেদের করা আর্থিক পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রেণিতে সবাই মিলে টাকা জমাও। একজন শিক্ষার্থী মাসে সর্বোচ্চ ৩০ টাকার বেশি জমাতে পারবে না। কীভাবে সেই টাকা জমানো হলো তা আর্থিক ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করো। পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে সবার টাকা একত্রিত করে মোট টাকার হিসেব করো এবং তা দিয়ে যেকোনো একটা ভিন্নধর্মী কর্মসূচির আয়োজন করো। প্রয়োজনে শিক্ষকের সাথে পরামর্শ করে নাও।)

স্কুল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট/হিসাব খোলা

তোমাদের নিজের নামে একটা ব্যাংক হিসাব খোলা হলে কেমন হবে বলতো? নিজেরাই তখন সেখানে টাকা জমাতে পারবে। এর জন্য প্রতিটি ব্যাংকে নির্দিষ্ট ফরম আছে। ফরমের তথ্যগুলো সঠিকভাবে পূরণ করতে হয়।

ব্যাংকে একটি অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য সাধারণত যা যা লাগে, সেগুলো হলো–

- শিক্ষার্থী ও বাবা-মা কিংবা আইনগত অভিভাবক প্রত্যেকের ০২ কপি করে পাসপোর্ট সাইজের ছবি
- জন্মনিবন্ধন সনদ বা স্কুল থেকে দেওয়া আইডি কার্ডের ফটোকপি কিংবা অন্য গ্রহণযোগ্য সার্টিফিকেট বাবা-মা কিংবা আইনগত অভিভাবকের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, কিংবা তাদের পরিচয়ের প্রমাণ হিসেবে ছবিযুক্ত অন্য যেকোনো ডকুমেন্ট (চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেট/প্রত্যয়নপত্র, পাসপোর্টের কপি, ড্রাইভিং লাইসেন্স এর কপি ইত্যাদি)
- হিসাব খুলে প্রাথমিকভাবে জমা দেওয়ার জন্য মাত্র ১০০ টাকা। তবে চাইলে বেশি টাকা জমা করেও হিসাব খোলা যাবে।

এবার এসো, আমরা একটি ব্যাংক হিসাব/অ্যাকাউন্ট এর নমুনা ফরমে সাধারণত কী কী থাকে তা জেনে নিই।

স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খোলার ফরম

ব্যাংক :...

শাখা :...

তারিখ :............................ হিসাব নং □□□□□□□□□□□□□

ইউনিক গ্রাহক আইডি কোড □□□□□□□□□□

(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

ম্যানেজার

.... ব্যাংক লিমিটেড

.... শাখা

প্রিয় মহোদয়,

আমি/আমরা আপনার শাখায় একটি হিসাব খোলার জন্য আবেদন করছি। আমার/আমাদের হিসাবসংক্রান্ত ও ব্যক্তিগত বিস্তারিত তথ্য নিম্নে প্রদান করছি :

[প্রথম অংশ : হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি]

১। হিসাবের শিরোনাম (বাংলায়) :...

In English (Block Letter) :...

২। হিসাবের প্রকৃতি (টিক দিন) : সঞ্চয়ী/ চলতি/ এসএনডি/ এফসি/ অন্যান্য

৩। মুদ্রা (টিক দিন) : টাকা/ ডলার/ ইউরো/ অন্যান্য

৪। হিসাব পরিচালনার পদ্ধতি : এককভাবে/যৌথভাবে/ অন্যান্য

৫। প্রাথমিক জমার পরিমাণ (অঙ্কে) :................................(কথায়) ....

[দ্বিতীয় অংশ: ব্যক্তিসংক্রান্ত তথ্যাদি]

১। হিসাবধারীর নাম (বাংলায়): ....

In English (Block Letter) : ....

২। জন্ম তারিখ: ....

৩। পিতার নাম: ....

৪। মাতার নাম: ....

৫। জাতীয়তা: ....৬। লিঙ্গ:..

(হিসাবধারী বিদেশি নাগরিক হলে ভিসাসহ পাসপোর্টের কপি আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করতে হবে)

৭। রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস (টিক দিন): রেসিডেন্ট/ নন-রেসিডেন্ট(প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশনের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে)

৮। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম :...

৯।অর্থেরউৎস(বিস্তারিত)...

১০। (ক) বর্তমান ঠিকানা: ....

ফোন/মোবাইল নম্বর:...

ইমেইল:...

(খ) স্থায়ী ঠিকানা: ....

ফোন/মোবাইল নম্বর:..ই-মেইল:...................................

১১। হিসাবধারী একাধিক হলে প্রত্যেকের এবং হিসাবধারী নাবালক হলে হিসাবধারীর অভিভাবক (বাবা অথবা মা অথবা অন্য কোনো আইনগত অভিভাবক) এর ব্যক্তিসংক্রান্ত তথ্যদি পৃথকভাবে দ্বিতীয় অংশে বা দ্বিতীয় অংশের সংলগ্নি হিসেবে যুক্ত করতে হবে।

১২। পরিচিতি পত্র: (ক) জন্ম নিবন্ধন নম্বর:..

অথবা, (খ) পাসপোর্ট নম্বর/অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):..

(গ) পরিচয়দানকারীর তথ্য (জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যতীত অন্যান্য পরিচিতিপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে):

নাম:...

হিসাব/জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (জন্ম তারিখসহ):..

স্বাক্ষর (তারিখসহ):...

[তৃতীয় অংশ: নমিনি–সংক্রান্ত তথ্যাদি]

১। নমিনি– সংক্রান্ত তথ্যাবলি: হিসাব নম্বর:..................

(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

আমি/আমরা এ হিসাবের অর্থ আমার/আমাদের মৃত্যুর পর নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণকে প্রদানের জন্য মনোনীত করলাম। আমি/আমরা উল্লিখিত মনোনয়ন যেকোনো সময় বাতিল বা পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণ করি। আমি/আমরা এ মর্মে আরও সম্মতি জ্ঞাপন করছি যে, আমার/আমাদের এ নির্দেশনা মোতাবেক ব্যাংক অর্থ প্রদান করবে এবং অর্থ পরিশোধ করা হলে সংশ্লিষ্ট আমানত সম্পর্কিত যাবতীয় দায় পরিশোধ হয়েছে বলে গণ্য হবে।

(ক) নমিনির নাম ও জন্ম তরিখ:...

(খ) ঠিকানা :...

....

(গ) শতকরা হার:....................................(ঘ) হিসাবধারীর সাথে সম্পর্ক:.....................

(ঙ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর/জন্ম নিবন্ধন নম্বর/অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):.................................

২। নমিনি নাবালক হলে তার/তাদের নাবালক থাকা অবস্থায় হিসাবধারী/হিসাবধারীগণের মৃত্যুর ক্ষেত্রে ব্যাংক-কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ১০৩(২) ধারা অনুযায়ী নমিনির পক্ষে আমানতের অর্থ গ্রহণকারীর তথ্য:

(ক) নাম:..

(খ) স্থায়ী ঠিকানা:..

(গ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/পার্সপোর্ট নম্বর/জন্ম নিবন্ধন/অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):........................

(ঘ) নমিনির সাথে সম্পর্ক:...

[ঘোষণা ও স্বাক্ষর]

আমি/আমরা সজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, উল্লিখিত তথ্যাদি সত্য। আমি/আমরা ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সরবরাহ করব।

আবেদনকারী(গণ)– এর নাম, স্বাক্ষর ও তারিখ

১। .... ২। .... ৩। ....

* ....

অভিভাবকের স্বাক্ষর.. ....

সঞ্চয় থেকে স্বপ্নপূরণ

উষা চাকমার ভীষণ ফুটবল প্রীতি। টিমে সে খুব ভালো খেলে। সে খাবার না খেয়ে একদিন কাটাতে পারে, কিন্তু ফুটবল না খেলে একদিনও থাকতে পারেনা। সে সপ্তাহে একদিন দেড় কিলোমিটার পায়ে হেঁটে দূরে শহরের খেলার মাঠে ফুটবল ক্লাবে খেলতে যায়। বাড়িতে খেলার জন্য তার কোনো ফুটবল নেই, নেই কোনো খেলার বুট কিংবা নীপ্যাড। খেলতে গিয়ে প্রায়ই ব্যথা পেয়ে বাড়ি ফিরে। ব্যথা নিয়েই সে রাত জেগে পড়ালেখা করে আবার সকালে উঠে স্কুলের পথে যাত্রা করে। স্কুলও খুব কাছে নয়। সেই পাহাড়ের ওপর। ব্যথা নিয়ে এতটা পথ হেঁটে আসা-যাওয়া করা খুবই কষ্টকর। কিন্তু আঁকাবাঁকা এই পাহাড়ি পথে রিকশা, ভ্যানেরও চলাচল নেই। ওর বন্ধুদের দু-একজনের সাইকেল আছে। ওরা পালা করে একেক দিন একেকজনকে লিফট দেয়। একদিন উষা ওর বন্ধু রনির সঙ্গে সাইকেলে যেতে যেতে জানতে চাইল তার সাইকেল কেনার বৃত্তান্ত। ওর গল্প শুনে উষা খুব অনুপ্রাণিত হলো এবং সে ঠিক করল রনির মতো আর্থিক ডায়েরি অনুসরণ করে অর্থ সঞ্চয় করবে এবং তার স্বপ্নের ফুটবল, বুট আর ফুটবল খেলার সামগ্রী কেনার জন্য একটি আর্থিক পরিকল্পনা শুরু করবে। যেই ভাবা, সেই কাজ। উষা টাকা জমাতে লাগল ব্যাংকে। বছর না ঘুরতেই তার জমানো টাকায় সে কিনে ফেলল তার মনের খিদে মেটানোর সামগ্রীগুলো। উষার খুশি আর ধরে না। কী যে আনন্দ লাগছে তার ! নিজের সঞ্চয় দিয়ে স্বপ্নপূরণে এত সুখ! আমরাও পারি, উষার মতো নিজেদের স্বপ্নপূরণের পথে এগিয়ে চলতে। তাই চলো সবাই–

ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা জমাই
আমার প্রয়োজন আমি মেটাই ।

স্বমূল্যায়ন

এই অধ্যায়ে আমরা যা যা করেছি টিক (✓) চিহ্ন দাও

কাজসমূহ	করতে পারিনি (১)	আংশিক করেছি (২)	ভালোভাবে করেছি (৩)
নিজের আয় ও ব্যয়ের হিসাব করা			
আর্থিক ডায়েরি লিখন			
আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে নিজের বদঅভ্যাস ও বিলাসিতা চিহ্নিত করা			
সঞ্চয় সংরক্ষণের উপায় অনুসন্ধানবিষয়ক দলগত কাজে অংশগ্রহণ			
শপিং গেমের মাধ্যমে সঞ্চয় অনুশীলন			
কিছু কেনার জন্য আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন			
আর্থিক পরিকল্পনার পোস্টার তৈরি			
বিশেষ কর্মসূচির জন্য প্রজেক্টের কাজে অংশগ্রহণ			
স্কুল ব্যাংকিংয়ের ফরম পূরণ			
স্কুল ব্যাংকিংয়ের হিসাব খোলা ও পরিচালনা করা			
মোট স্কোর : ৩০ তোমার প্রাপ্ত স্কোর : শিক্ষকের মন্তব্য:			

তোমার প্রাপ্তি?			
তুমি যা পেলে তা নিয়ে তোমার মনের অবস্থা চিহ্নিত করো	একদম ভালো লাগছে না; অধ্যায়ের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আমার জানা খুব জরুরি।	আমার ভালো লাগছে; কিন্তু অধ্যায়ের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানা প্রয়োজন।	আমার বেশ ভালো লাগছে; কাজগুলোর নিয়মিত চর্চা আমি অব্যাহত রাখব।

... সব সময় সবাই মিলে এমন হাসি হাসতে চাই।।

সুতরাং এভাবে হাসতে হলে এই অধ্যায়ের যেসব বিষয়গুলো আমাকে আরও ভালোভাবে জানতে হবে তা লিখ

যে কাজগুলোর নিয়মিত চর্চা আমাকে চালিয়ে যেতে হবে তা লিখ

আমার জীবন আমার লক্ষ্য

আমাদের ইচ্ছে বা স্বপ্নগুলো স্বাধীন।

আমরা মাঝে মাঝে নিজেকে নিয়ে

অনেক মজার মজার স্বপ্ন দেখি।

আমাদের কখনো-

ইচ্ছে করে নীল আকাশে
পাখির মতো উড়তে
ইচ্ছে করে সাগর সেঁচে
মণিমুক্তা খুঁজতে !

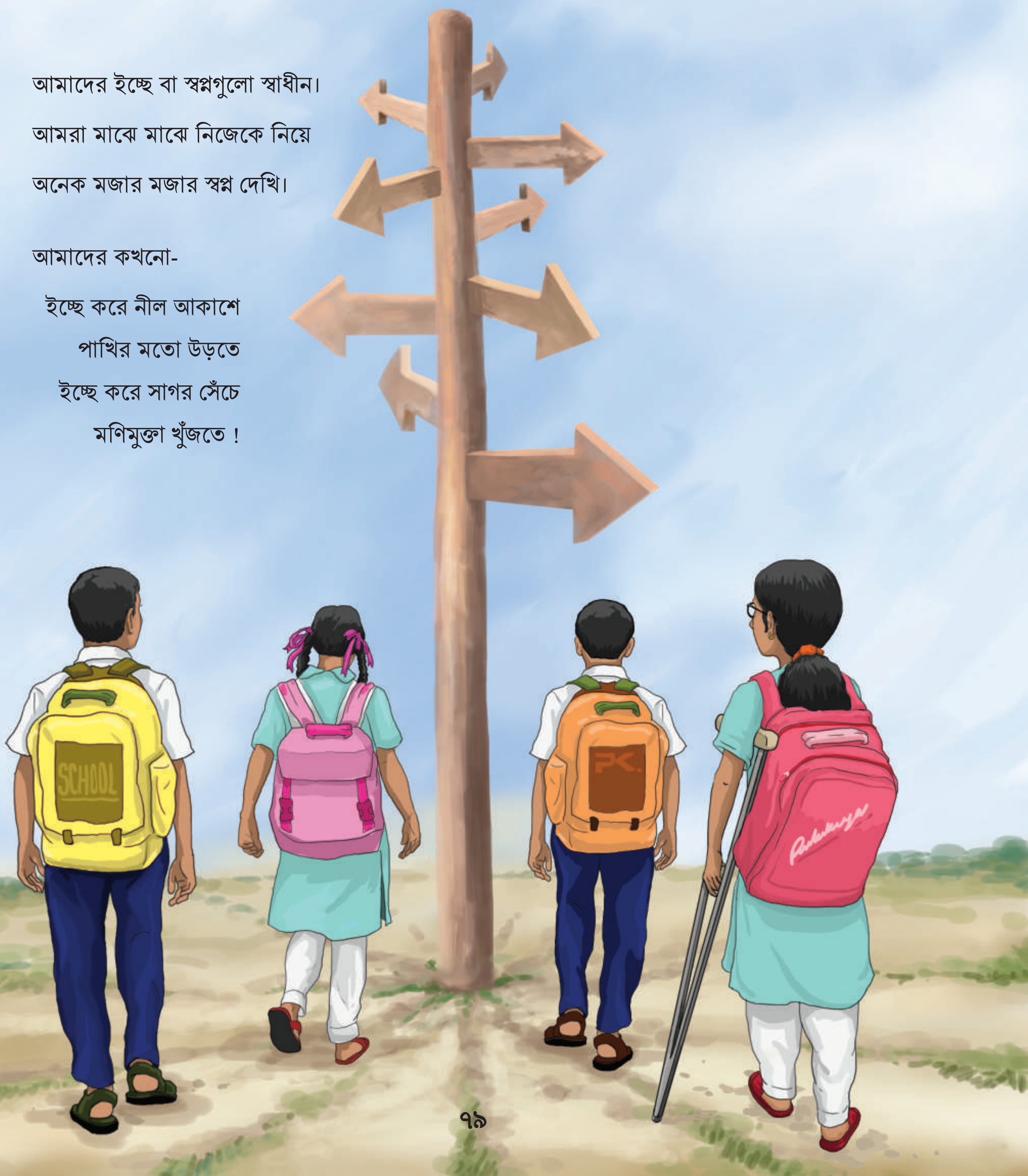

আমাদের মন অনেক কিছুই চায়। কখনো বিজ্ঞানী, কখনো পাইলট , কখনো ডুবুরী, কখনো শিক্ষক, কখনো বা ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে উঁকি মারে মনের আকাশে। তুমিও নিশ্চয় মাঝে মাঝে ভাবো বড় হয়ে আমি এর মতো হতে চাই বা ওর মতো হতে চাই। আমরা আমাদের চারপাশে মানুষদের দেখে কিংবা সমাজ ও পরিবেশে মানুষের অবদান সম্পর্কে জেনে নিজেও সেরকম কিছু করার বা হবার ইচ্ছা পোষণ করি। এই ইচ্ছা বা স্বপ্নগুলো অনেক সময় আমার যা যা পছন্দ বা ভালোলাগা রয়েছে তার ওপর নির্ভর করে। সেই সঙ্গে আমি যা করতে পারি বা যে কাজে আমি বেশি দক্ষ তা-ও আমার স্বপ্ন তৈরিতে অবদান রাখে। এক বা একাধিক কিছু করার বা হবার এই স্বপ্নই একসময় আমাদের লক্ষ্য স্থির করে দেয়।

নিজের পছন্দ ও দক্ষতা

চিত্র ৫.১ : পলাশের সবজি বাগান

চলো, আমরা আমাদের কয়েকজন বন্ধুর গল্প শুনি–

পলাশদের বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে যাওয়ার রাস্তাটা খুব সুন্দর। মাঠের মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা একটা রাস্তা দিয়ে তাঁরা দলবেঁধে স্কুলে যায়। স্কুলে যাওয়ার পথের দুই পাশে ফসলের মাঠের দিকে তাকালে তার খুব ভালো লাগে। মাঠে কখনো থাকে সরিষা ফুল , কখনো ধান, কখনো থাকে নানা রকমের সবজির ক্ষেত। তার বাবা-চাচারাও এখানকার মাঠেই সারা বছর বিভিন্ন ফসলের চাষ করেন । স্কুল বন্ধ থাকলে পলাশও তার বাবার সঙ্গে মাঠে যায়, বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করে যেমন চারা লাগায়, সার দেয়, পানি দেয়, আগাছা বাছাই করে, মাটি নিড়ানি দেয়। আবার বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে মাঠেই খেলাধুলা করে। ফসল কাটার সময় বাবাকে ফসল কাটতে ও সুন্দর করে গুছিয়ে রাখতে সহায়তা করে। একসময় তার বাবা ফসল বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতেন।

একদিন পলাশ টিভিতে একটি অনুষ্ঠান দেখে কীভাবে অনলাইনে ফসল বিক্রি করা যায় এবং তার বাবাকে তা জানায়। এরপর থেকে তার বাবা বাসায় বসেই ফসল বিক্রি করতে শুরু করেন। পলাশদের বাড়ির সামনেও সুন্দর একটি বাগান আছে, যেখানে বিভিন্ন রকম ফুল ও সবজির গাছ রয়েছে। পলাশ তার মায়ের উৎসাহে এবার কিছু মরিচ, পুঁইশাক ও বেগুনের চারা উৎপাদন করেছে, যেগুলো এবার বাজারে বিক্রি করবে ভেবেছে। স্কুলের একটি প্রকল্পে পলাশ দেখিয়েছে কৃষিকাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কাজ সঠিকভাবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে করে কীভাবে একজন সফল কৃষক হওয়া যায় এবং দেশে অবদান রাখা যায়।

স্বপ্ন: আধুনিক কৃষি উদ্যোক্তা হওয়া

পলাশের পছন্দ : স্কুলে যাওয়া, বাবার সঙ্গে কাজ করা, বাগান করা, বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করা, চারা উৎপাদন করা, বিক্রি করতে পারা।

চিত্র ৫.২: তারাভরা আকাশ

সাদিয়া ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলা ও চিত্রাঙ্কনের প্রতি তার আগ্রহ। পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মিত চিত্রাঙ্কন শেখে। বাবা মায়ের সঙ্গে বেড়াতে পছন্দ করে, ঘরের কাজ করে, কমিকস, ছড়া ও সায়েন্স ফিকশন বই পড়তে পছন্দ করে। বাসায় তার পোষা বিড়ালের সঙ্গে খেলা করে, বারান্দায় বাগান করে, বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করে। বাসায় তার বাবার কম্পিউটারে একটু একটু করে চিত্রাঙ্কন করা শেখে, কখনো কখনো অনলাইনে কোডিং এর বই পড়ে ও প্রোগ্রামিং করা শেখে। একটি প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সে

পুরস্কারও পেয়েছে। তার প্রিয় শিক্ষকের পরামর্শে মহাকাশবিষয়ক কয়েকটি অনলাইন আলোচনায় অংশগ্রহণ করে এবং মহাকাশে নভোচারীরা কীভাবে রকেটে করে যাতায়াত করে সে বিষয়ে অনেক মজার মজার তথ্য জেনেছে। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু-১ নামে বাংলাদেশেরও এখন একটি স্যাটেলাইট আছে জেনে তার খুব গর্ব হয়। তার খুব ইচ্ছা বড় হয়ে সে-ও মহাকাশ নিয়ে পড়াশোনা করবে।

স্বপ্ন: ____________________

সাদিয়ার পছন্দের কাজ : ____________________

চিত্র ৫.৩: মাকে সাহায্য করছে রিফাত

রিফাতের মা তাদের বাসায় কাপড় সেলাইয়ের কাজ করেন। রিফাত মাকে বিভিন্ন কাজে সহায়তা করে যেমন – কাপড় কাটতে ও বানানো শেষ হলে ভাঁজ করে প্যাকেট করতে, তৈরি পোশাক ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং বিভিন্ন সময় মায়ের সঙ্গে কাপড় কিনতে বাজারেও যায়। তার স্কুলের অনেকেই তার মায়ের কাছ থেকে স্কুল ড্রেস বানিয়ে নেয়। মায়ের সঙ্গে কাজ করতে করতে রিফাত অনেক কিছু শিখেছে। তার এইসব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে স্কুলের যেকোনো অনুষ্ঠানে সে বেশ ভালো ভূমিকা রাখতে পারে। সে তার বন্ধুদের

সে তার বন্ধুদের সাথে নিয়ে সুন্দরভাবে এসব আয়োজন করতে পারে। যেমন- এবারের স্কুলের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে গিয়ে মঞ্চ সাজানো, প্রতিযোগীদের পোশাক ঠিক করা ও উপস্থাপনা করার সব আয়োজনে ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব দিয়েছে সে। এ জন্যই স্কুলের শিক্ষক ও তার বন্ধুরা তাকে খুব পছন্দও করে। রিফাতের ইচ্ছা, বড় হয়ে সে তার মায়ের মতো পোশাক তৈরি ও সাজসজ্জা নিয়ে কাজ করবে। তার স্বপ্ন তার নিজের ডিজাইন করা পোশাকের একটি সুন্দর দোকান থাকবে, যেখানে ছোট বড় সবার সুন্দর সুন্দর পোশাক পাওয়া যাবে এবং যে কেউ ইচ্ছে করলে তার দোকান থেকে বানিয়ে নিতেও পারবে।

স্বপ্ন: ______________________________

রিফাতের পছন্দের কাজ : ______________________________

চিত্র ৫.৪: গার্ল গাইড কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

আসমা ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী হলেও সে তার ছোট ভাইবোনদের প্রতি খুবই যত্নশীল, তার ছোট ভাইকে পড়ালেখায় সহায়তা করে, সঙ্গে করে স্কুলে নিয়ে যায়। বাসায় কেউ কিছু খুঁজে না পেলে আসমার ডাক পড়ে ; আসমা কীভাবে যেন ঠিকই সব খুঁজে পায়। সে অবসরে টিভি দেখতে পছন্দ করে, অনলাইনে কার্টুন দেখে, বিভিন্ন অনলাইন গ্রুপে গল্প পড়ে ও নিজের গল্প লিখে শেয়ার করে। সেবামূলক কাজের প্রতি তার গভীর আগ্রহ থেকে বিদ্যালয়ের গার্লস গাইডস ও রেড ক্রিসেন্ট কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। ইদানীংকালে যেসব দুর্যোগ হয়েছে সেসময় কীভাবে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ কাজ করেছে এবং চিকিৎসা সেবা পেয়েছে সেই বিষয়ে ছবি এঁকে স্কুলের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন পুরস্কারও পেয়েছে। তার ইচ্ছা ভবিষ্যতে সে মানব সেবামূলক কাজে যুক্ত হবে।

স্বপ্ন: ____________________

আসমার পছন্দের কাজ : ____________________

____

তোমাদের কয়েকজন বন্ধুর গল্প জেনেছ এবং তাদের কী কী পছন্দ তা-ও বের করতে পেরেছ। এবার আমরা প্রত্যেকে নিজেদের পছন্দ বা ভালোলাগা এবং দক্ষতাগুলো নির্বাচন করব।

ছক-৫.১ এ প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে কিছু নমুনা পছন্দ দেওয়া আছে। প্রতিটি বিষয়ের বিপরীতে তোমার পছন্দ বা ভালোলাগা নির্বাচন করো। যে কাজগুলো তুমি অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারো বা দক্ষতা আছে তা নির্বাচন করো। যেগুলো তোমার অপছন্দ বা ভালো লাগে না সেগুলোও নির্বাচন করো। তোমার পছন্দ, দক্ষতা ও অপছন্দসমূহ উদাহরণে না থাকলে তুমি নিজে তা যোগ করে নিতে পারো।

ছক ৫.১ : নিজেকে চেনা

নং	বিষয়	আমার যা ভালোলাগে বা পছন্দ	আমি যা ভালোভাবে করতে পারি (আমার দক্ষতা)	আমার ভালো লাগে না বা অপছন্দ
১.	খেলা: ক্রিকেট, ফুটবল, কাবাডি, হ্যান্ডবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, দাবা, এথলেটিকস (দৌড়, হাইজাম্প-লংজাম্প ইত্যাদি) গোল্লাছুট, দাঁড়িয়াবান্ধা, বউচি, কানামাছি, ক্যারম, লুকোচুরি, এক্কাদোক্কা, সাতচাড়া, লুডু, ডাঙ্গুলি, মোবাইল বা কম্পিউটার গেম, সাঁতার, সাইকেল চালানো, লাটিম, শরীরচর্চা, ঘুড়ি উড়ানো অন্যান্য...			
২.	সৃজনশীল কাজ : ছবি আঁকা, কারুকাজ, কমিকস বানানো, অরিগামি (কাগজ দিয়ে কিছু বানানো), গল্প/কবিতা লেখা, কবিতা আবৃত্তি করা, গান করা, গান শোনা, নাচ করা, স্কাউট, গার্ল গাইডে, ছবি তোলা, ভিডিও বানানো, বাগান করা, সংগঠন করা, বিতর্ক করা, উপস্থিত বক্তৃতা, বাঁশি, হারমোনিয়াম, তবলা, গিটার ইত্যাদি বাজানো, অন্যান্য ...			

৩.	ঘরের কাজ : ঘর গোছানো, থালা-বাসন পরিষ্কার, কাপড় ধোয়া, ঘর সাজানো, খাবার তৈরি, বিছানা গোছানো, গাছের পরিচর্যা, পোষা প্রাণীর পরিচর্যা, ছোটদের-বড়দের যত্ন নেওয়া, বাজার করা, বাগান করা, অন্যান্য ...			
৪.	বই পড়া : গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ধর্মীয়/ঐতিহাসিক গ্রন্থ, ভ্রমণকাহিনি কমিকস, সায়েন্স ফিকশন, ভৌতিক, জীবনী, কৌতুক, বিজ্ঞান সাময়িকী, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, অন্যান্য ...			
৫.	নতুন কিছু বা শখ : বিভিন্ন ভাষা শেখা, হাতের কাজ, নতুন খেলা শেখা, নতুন রান্না, বন্ধু তৈরি, কয়েন সংগ্রহ, ডাকটিকিট সংগ্রহ, সুন্দর হাতের লেখা, গিফ্ট কার্ড বানানো, পিকনিক/বেড়াতে যাওয়া, অন্যান্য			
৬.	.... (অন্যান্য)			

ছকটি পূরণ করে তুমি তোমার পছন্দ ও দক্ষতাগুলো নিশ্চয়ই জেনেছ। তাহলে এবার চলো তোমার পছন্দ ও দক্ষতাসমূহ বিবেচনা করে ভবিষ্যতে তুমি কী কী করতে চাও বা কী কী হতে চাও তার একটি তালিকা তৈরি করি।

ছক ৫.২ : আমার ইচ্ছা তালিকা

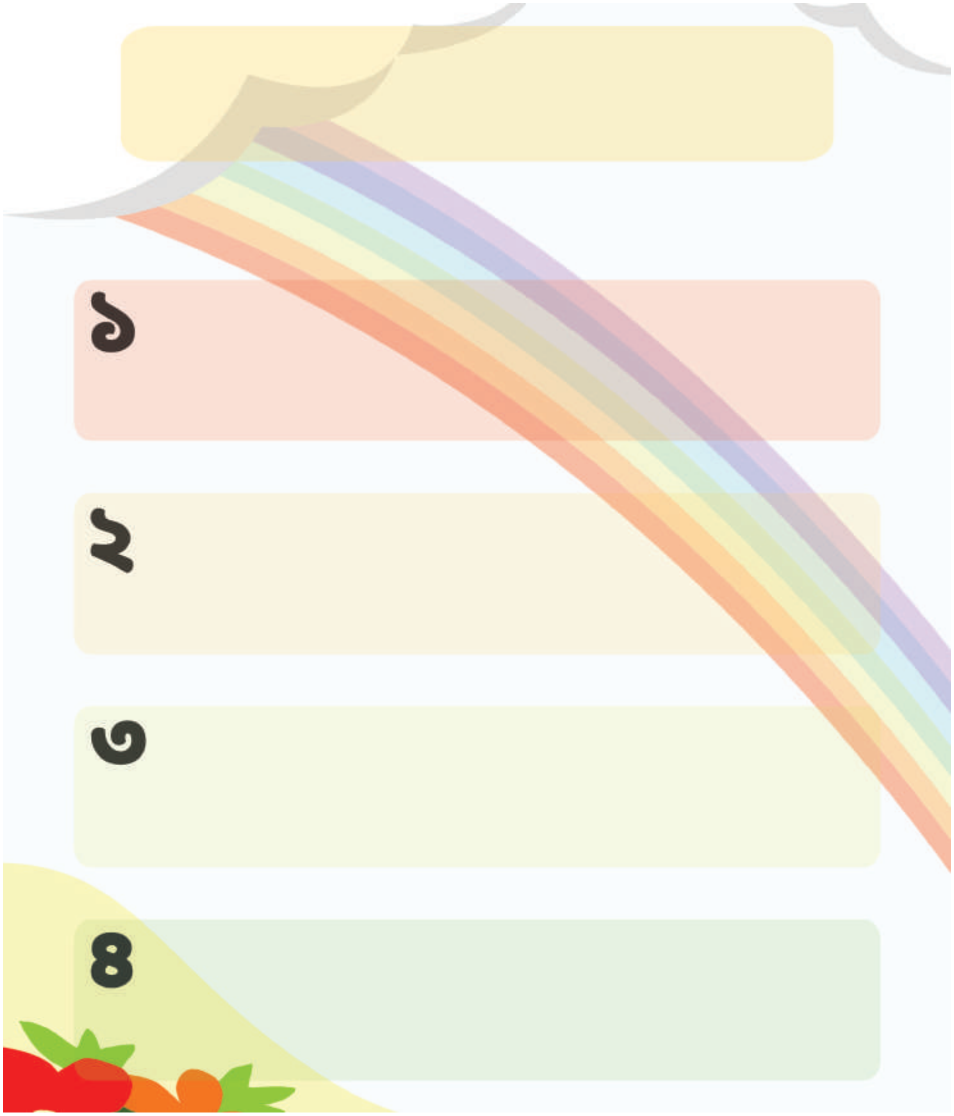

নিজেকে নিয়ে তোমার যেমন অনেক পরিকল্পনা বা স্বপ্ন রয়েছে, তেমনি তোমাকে নিয়ে হয়তো তোমার মা-বাবা, ভাই-বোন, পরিবারের অন্য কোনো সদস্য এবং বন্ধুবান্ধবের অনেক স্বপ্ন থাকতে পারে।

চলো একটা মজার কাজ করি। তোমার অভিভাবক, ভাই-বোন ও বন্ধু-বান্ধবের কাছে জিজ্ঞাসা করো- তোমার পছন্দ কী, তোমার যোগ্যতাগুলো কী এবং তারা তোমাকে ভবিষ্যতে কী হিসেবে দেখতে চায়। মা, বাবা, ভাই, বোন ও বন্ধুদের জন্য নিচের ছক অনুযায়ী তোমার খাতার আলাদা আলাদা পৃষ্ঠায় ছক তৈরি করো। আলাদা আলাদা করে সবার মতামত গ্রহণ করার পর নিচের ছকে মতামতগুলো লিখ।

ছক ৫.৩: নিজের সম্পর্কে নিকটজনের ভাবনা

	পছন্দ	যোগ্যতা	ভবিষ্যতে কী হিসেবে দেখতে চায়
অভিভাবক ১ সম্পর্ক :			
অভিভাবক ২ সম্পর্ক :			
ভাই ১ নাম :			
বোন ২ নাম :			
বন্ধু ১ নাম :			
বন্ধু ২ নাম :			

তোমার নিকটজনের ভাবনার সঙ্গে তোমার ভাবনার (স্বপ্ন, পছন্দ-অপছন্দ, দক্ষতা) কতটুকু মিল বা অমিল রয়েছে তা তুলনা করে দেখ।

দারিদ্র্য জয় করে দরিদ্রের পাশে

শৈশব থেকেই দারিদ্র্য ফরিদের নিত্যসঙ্গী। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়াকালে তাঁর শিক্ষক বাবা প্রাইমারি স্কুল থেকে অবসরে যান। তখন মা কাজ শুরু করেন একটা এনজিওতে মাঠকর্মী হিসেবে। অভাব-অনটনের সংসার। তাই কোনো কোনো বেলা ভরপেট খাবারও কপালে জুটত না। শৈশব কেটেছে খড়ের চালার কুঁড়েঘরে, বৃষ্টি হলেই টিপটিপ করে পানি গড়িয়ে পড়ত। কেরোসিন কেনার পয়সা ছিল না। তাই কখনো জ্যোৎস্নায় চাঁদের আলোয় কিংবা কখনো মা যখন রান্না করতেন, পাশে বসে পড়াশোনা করেছেন।

চিত্র ৫.৫: চুলার আলোয় ফরিদের পড়াশোনা

প্রাইমারি স্কুল থেকেই চাষাবাদ থেকে শুরু করে করতে হয়েছে গৃহস্থালির সব ধরনের কাজ। বিজ্ঞানের প্রতি তার ছিল অদম্য আগ্রহ। যে কোনো ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করত। তার কৌতুহল ছিল সব কিছুর ওপর। কিন্তু, জীবনের প্রথম ধাক্কা আসে যখন দারিদ্রতার কারণে পঞ্চম শ্রেণিতে থাকার সময় পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। তবে সহজেই হাল না ছেড়ে এত প্রতিকূলতার মধ্যেও জীবনে বড় হওয়ার স্বপ্নটি আগলে রেখেছিল ছেলেটি। তার স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে সে বিখ্যাত বিজ্ঞানী হবেন। নিজের স্বপ্নের প্রতি অবিচল থেকে ছেলেটি একের পর এক ধাপ অতিক্রম করে আজ জগৎখ্যাত বিজ্ঞানী ড. সি এন ফরিদ।

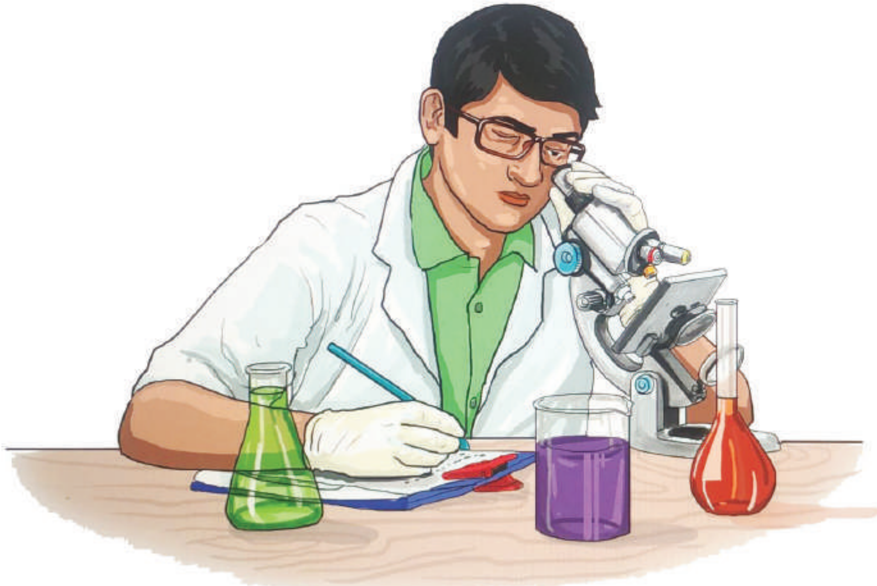

চিত্র ৫.৬: গবেষণায় মগ্ন ফরিদ

বিরুয়া আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি পাস করে ভর্তি হন কোনো এক শহরের এক নামী কলেজে। কলেজে পড়ার সময় কখনো আত্মীয়ের বাসায় কিংবা কখনো চারতলা বিল্ডিংয়ের ছাদে পুরোনো তিন কোনা একটা পানির ট্যাঙ্কের পাশে বানানো একটা ছোট্ট রুম ভাড়া নিয়ে কোনোরকমে দিনাতিপাত করতে হয়েছে তাকে। শুনতে যতটা সহজ মনে হচ্ছে, ফরিদের এই যাত্রা মোটেও এতটা সহজ ছিল না। টেস্ট পরীক্ষায় কলেজে সবার সেরা হয়েও সংশয় ছিল এইচএসসি পরীক্ষায় বসা নিয়েই। অর্থের অভাবে এইচএসসি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন করতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত বন্ধুবান্ধব ও শিক্ষকদের সহযোগিতায় টাকা জোগাড় হলো। নির্দিষ্ট সময়ের পর জরিমানা ফি দিয়ে পরীক্ষায় বসলেন, কলেজ থেকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে পাস করলেন, রেজাল্টের দিক দিয়ে আবারও ছাড়িয়ে গেলেন সবাইকে।

এইচএসসির পর যেন জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্নটা ধরা দিল। ভর্তির সুযোগ পেলেন বাংলাদেশের শীর্ষ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরপর ফরিদকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। পড়াশোনা শেষ করে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেলেন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই। বিদেশি একটি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করার ডাক পেলেন। সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে সামনে এগিয়ে চলেছেন। পদার্থবিদ্যা নিয়ে গবেষণায় এখন তিনি সারা পৃথিবীর এই প্রজন্মের বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। বর্তমানে বিদেশি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর পাশাপাশি বিভিন্ন গবেষণাকর্মে নেতৃত্ব প্রদান করছেন তিনি।

একসময়ে ফরিদের মা বলতেন, 'পড়াশোনাটা জীবনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। এর মাধ্যমেই জীবনের স্বপ্নপূরণ সম্ভব।' মায়ের কথা রেখেছেন ফরিদ। পড়াশোনা করে শুধু নিজের স্বপ্ন বাস্তবায়নই করেননি। উঠেছেন সাফল্যের চূড়ায়। জীবনের পদে পদে দারিদ্র্যতা নামের যে প্রতিবন্ধকতা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই শিকড়কে, নিজের দেশকে ভুলতে রাজি নন ফরিদ। বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত মেধাবী শিক্ষার্থী ও দরিদ্র পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। দারিদ্র্যের জন্য কারও জীবন যাতে থেমে না যায়, জীবনে চলার পথে কেউ যাতে

পিছিয়ে না পড়ে, সেই তাড়না থেকেই প্রতিষ্ঠা করেন একটি চ্যারিটি ফাউন্ডেশন। প্রতি বছর এই ফাউন্ডেশন থেকে সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের সহায়তা, শীতার্ত মানুষের জন্য গরম কাপড়, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ এবং চিকিৎসাসেবাসহ নানা সহায়তা দেওয়া হয়।

- গল্পের চরিত্রের কী স্বপ্ন ছিল?
- স্বপ্ন অথবা জীবনের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কীভাবে পরিকল্পনা ও কাজ করলেন?

তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছ, একটি স্বপ্নের প্রতি অবিচল থেকে যথাযথ পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যেতে পারলে লক্ষ্য অর্জন করা যায়। লক্ষ্য অর্জন করতে নিজের ইচ্ছাশক্তি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি পরিকল্পিতভাবে ধাপে ধাপে স্বপ্নের দিকে এগিয়ে যেতে হয়।

চলো আমরা ইচ্ছাগুলোর যে তালিকা তৈরি করেছিলাম সেখান থেকে একটি ইচ্ছা বা লক্ষ্যকে নির্বাচন করি। এমন একটি লক্ষ্য আমরা নির্বাচন করবো যা–

- সুনির্দিষ্ট হবে, (অর্থাৎ কী হতে চাই সরাসরি সেটি নির্বাচন করতে হবে)
- অর্জনযোগ্য হবে, (অর্থাৎ অবাস্তব কল্পনাপ্রসূত কিছু হবে না)
- সময়াবদ্ধ হবে, (অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময়ে ইচ্ছেটা পূরণ করা সম্ভব হবে)

ছক ৫.৪ : নিজের ভাবনা

লক্ষ্য অর্জন করার জন্য পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। যথাযথ পরিকল্পনা করার অর্থ হলো কাজের প্রায় অর্ধেক সম্পন্ন করা। পরিকল্পনা করার সময় লক্ষ্যকে প্রথমে কয়েকটি ছোট ছোট ধাপ বা মাইলস্টোনে ভাগ করে নিতে হয়। তারপর প্রতিটি মাইলস্টোন অর্জন করার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে হয়। সবশেষে এই মূহুর্তে কী কী করা প্রয়োজন তা সুনির্দিষ্ট করতে হয়। অর্থাৎ পরিকল্পনাকে দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও স্বল্প মেয়াদি ধাপ ভেঙে তারপর প্রতিটির জন্য আলাদা আলাদা পরিকল্পনা করতে হয়।

প্রতিটি ধাপের সময়ও নির্ধারণ করতে হবে এবং এটা নির্ভর করে যে ভবিষ্যতের ইচ্ছা কোন সময়ের মধ্যে অর্জন করতে চাচ্ছি। যেমন- আমার ভবিষ্যতের ইচ্ছা যদি ১০ বছর পর হয়, তাহলে এখন থেকে ১০ বছর পর ৩ ধাপে ভাগ করা যায়, যাতে দীর্ঘমেয়াদি হবে ১০ বছর পর, মধ্যেমেয়াদি হবে ৫ বছর পর, স্বল্পমেয়াদি হবে ১ বছর পর।

চলো তোমাদের এক বন্ধু কীভাবে তার ভবিষ্যতের লক্ষ্য অর্জনের পরিকল্পনা করেছে তা দেখি। তারপর নিচের খালিঘরে তোমার নির্বাচিত লক্ষ্য অনুযায়ী দীর্ঘমেয়াদে, মধ্যমেয়াদে ওস্বল্পমেয়াদে কী করতে পারো তা পূরণ করার চেষ্টা করো।

ছক ৫.৫ : লক্ষ্য পূরণের পরিকল্পনা

লক্ষ্য	দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা	মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা	স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা	এখনই কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়
টাইম মেশিন আবিষ্কার করব ২০৩৭	১. বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ সাফল্যের সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানের পড়াশোনা শেষ করব। ২. বৈজ্ঞানিক হিসেবে গবেষণা করব এবং গবেষণা থেকে নতুন চিন্তা নিয়ে লেখালেখি করব। ১০-১২ বছর পর	১. উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করে বিশ্ব বিদ্যালয়ে ভর্তির চেষ্টা করব ২. বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে জানব ৫-৭ বছর পর	বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি ও বাংলা বিষয়গুলো ভালো ভাবে পড়ব ও বৈজ্ঞানিক হওয়ার বিষয় সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানব প্রথম বছর	দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক রুটিন প্রণয়ন করা যার মাধ্যমে আমি প্রতিটি বিষয় ভালোভাবে শিখতে পারি। এই বছরের আগামী সকল পরীক্ষায় আমি ভালো ফলাফল করতে পারি। আজকেই!

তোমার ভবিষ্যতের ইচ্ছা/ লক্ষ্য	দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা	মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা	স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা	এখনই কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়

এবার তোমার দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক রুটিন প্রণয়ন কর। সেই অনুযায়ী আজ থেকেই কাজ শুরু করো।

ছক ৫.৬ : লক্ষ্যে পৌছানোর রুটিন কাজ

লক্ষ্যে পৌছাতে হলে দৈনিক আমাকে যা যা করতে হবে	
লক্ষ্যে পৌছাতে হলে সপ্তাহে আমাকে যা যা সম্পন্ন করতে হবে	
লক্ষ্যে পৌছাতে হলে প্রতি মাসে আমাকে যা যা সম্পন্ন করতে হবে	
মাস শেষে আমার অনুভূতি (আত্মপ্রতিফলন)	
অভিভাবকের মন্তব্য বা স্বাক্ষর:	

ভবিষ্যতের ইচ্ছা বা লক্ষ্য পুরণ করার জন্য দীর্ঘমেয়াদ, মধ্যমেয়াদ এবং স্বল্পমেয়াদে এখনই কী করবে এই পরিকল্পনার পদ্ধতিকে ব্যাকওয়ার্ড প্ল্যানিং অথবা ব্যাককাস্টিং বলা হয়। তবে লক্ষ্য রাখবে যে, এটাই পরিকল্পনা করার জন্য একমাত্র কৌশল না, একধরনের কৌশল মাত্র। এই ধরণের আরও অনেক কৌশল রয়েছে । এই পরিকল্পনায় তুমি নিয়মিত চোখ রাখো, যাতে তুমি এখন কী করবে তা বুঝে নিতে পারো। বছরের শেষে পর্যালোচনা করে দেখবে, যে পরিকল্পনা তুমি নিয়েছো সেটি অনুযায়ী তোমার কাজে অগ্রগতি হচ্ছে কিনা এবং তোমার পরিকল্পনায় কোনো পরিবর্তন আনতে হবে কিনা। যদি পরিবর্তন আনা প্রয়োজন মনে করো, তাহলে সেভাবে পরিবর্তন করে নাও।

স্বমূল্যায়ন

এই অধ্যায়ে আমরা যা যা করেছি.. ... ... টিক (✓)চিহ্ন দাও

কাজসমূহ	করতে পারিনি (১)	আংশিক করেছি (২)	ভালোভাবে করেছি (৩)
প্রদত্ত কেসের ব্যক্তিদের স্বপ্ন ও পছন্দের কাজ শনাক্ত করা			
আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে নিজেকে চেনার চেষ্টা করা			
নিজের ইচ্ছে তালিকা তৈরি			
অভিভাবক, স্বজন ও বন্ধুদের দৃষ্টিতে আমার যোগ্যতা শনাক্ত করা			
নিজের স্বপ্ন বা লক্ষ্য (আপাত)নির্বাচন করা			
নিজের স্বপ্ন বা লক্ষ্য পৌঁছানোর জন্য স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা করা			
নিজের স্বপ্ন বা লক্ষ্য পৌঁছানোর জন্য মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা করা			
নিজের স্বপ্ন বা লক্ষ্য পৌঁছানোর জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করা			
পরিকল্পনা অনুযায়ী দৈনন্দিন রুটিন প্রণয়ন করা			
পরিকল্পনা অনুযায়ী দৈনন্দিন রুটিন অনুসরণ করা			

মোট স্কোর: ৩০

তোমার প্রাপ্ত স্কোর:

শিক্ষকের মন্তব্য:

তোমার প্রাপ্তি?			
তুমি যা পেলে তা নিয়ে তোমার মনের অবস্থা চিহ্নিত কর	একদম ভালো লাগছে না; অধ্যায়ের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আমার জানা খুব জরুরি।	আমার ভালো লাগছে ; কিন্তু অধ্যায়ের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানা প্রয়োজন।	আমার বেশ ভালো লাগছে ; কাজগুলোর নিয়মিত চর্চা আমি অব্যাহত রাখবো।

... সব সময় সবাই মিলে এমন হাসি হাসতে চাই।।

সুতরাং এভাবে হাসতে হলে এই অধ্যায়ের যেসব বিষয়গুলো আমাকে আরও ভালোভাবে জানতে হবে তা লিখ

যে কাজগুলোর নিয়মিত চর্চা আমাকে চালিয়ে যেতে হবে সেগুলো লিখি

দশে মিলে করি কাজ

অনুপদের স্কুলটি বেশ সুন্দর। গাছপালায় ঘেরা বড় খেলার মাঠ ওদের। ক্লাসগুলোও অনেক বড়। ক্লাসে ওদের শিক্ষকরা প্রায়ই ওদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের পোস্টার তৈরি করতে দেন। ওরা পোস্টার বানিয়ে রশিতে ঝুলিয়ে দেয়। কিন্তু ক্লাসজুড়ে রশি ঝুলে থাকায় ক্লাসের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। তা ছাড়া ফ্যানের বাতাসে অনেক সময় পোস্টারগুলো ছিঁড়ে যায়। এ কারণে ওরা সবাই মিলে মিটিং করে ঠিক করল, ক্লাসে একটা ডিসপ্লে বোর্ড বানাবে। ককশিট দিয়ে নিজেরাই নকশা করে বোর্ডটি বানাতে চায় তারা। এ জন্য তারা সবাই মিলে একটা পরিকল্পনা করল। দেয়ালে লাগানোর আঠা, ককশিট, ডিজাইন করার কাগজ, বোর্ড পিন ইত্যাদি মিলিয়ে মোট খরচ কত হতে পারে তা হিসাব করল। পরিকল্পনা অনুযায়ী এক সপ্তাহে সবার টিফিন ও অন্যান্য খরচ থেকে বাঁচিয়ে কিছু টাকা জোগাড় করল। নিজেদের ইচ্ছার কথা কয়েকজন গিয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে জানালে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কিছু খরচ ওদের হাতে তুলে দেন। পরিকল্পনা শুনে তাদের ক্লাসের শিক্ষক ও টুকটাক কিছু ফান্ড দিলেন। আর তাতেই হয়ে গেল ওদের খরচের টাকা। ব্যস, কয়েকজন মিলে কিনে আনল প্রয়োজনীয় সামগ্রী। বৃহস্পতিবার খেলার ক্লাসে সবাই মিলে বানিয়ে ফেলল ডিসপ্লে বোর্ড। শিক্ষকের পরামর্শও সহায়তায় দেয়ালে আঠা দিয়ে সেঁটে দিল বোর্ডটি। বোর্ডের এককোনায় ক্লাস রুটিন টানিয়ে দিল। বোর্ড পিনগুলো সাজিয়ে রাখল আরেক কোনায়। এখন কেউ ইচ্ছে করলে নিজের আঁকা ছবি, গল্প, কবিতা বা সৃজনশীল কোনো কাজ এখানে টানিয়ে দিতে পারবে। আবার কাজের সময় পোস্টার ডিসপ্লে তো করাই যাবে! দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছে শ্রেণিকক্ষটি। সৃষ্টির আনন্দে সবাই খুব খুশি।

অনুপদের ক্লাসে সবাই মিলে কেন ডিসপ্লে বোর্ড বানালো?

সমস্যা খুঁজি

গুহাবাসী মানুষের ইতিহাস তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ। তারাও প্রতিদিন নানা সমস্যায় পড়তেন। কখনও দেখা যেত, শিকার করতে গিয়ে অস্ত্র হারিঁয়ে গেছে বা ভেঙে গেছে, অথবা তাদের বসবাসের গুহা পানিতে ডুবে গেছে। এভাবে মানব ইতিহাসের শুরু থেকেই মানুষ সমস্যাকে সাথী করেই বসবাস করে আসছে। এখনও প্রতিদিন চলার পথে পরিবার, সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে আমরা নানা সমস্যার মুখোমুখি হই। কিছু কিছু সমস্যা আছে যেগুলো আমরা চাইলে নিজেরাই সমাধান করে ফেলতে পারি। আমরা আমাদের বুদ্ধি খাটিয়ে, সবার সঙ্গে আলোচনা করে, বিভিন্নজনের সহযোগিতায় এসব অনেক সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারি। এতে একধরনের ভালোলাগা যেমন আছে, তেমনি আমাদের আত্মবিশ্বাসও বেড়ে যায়। অনুপদের স্কুলের কথা একবার ভাবো তো! যেকোনো ভালো কাজ বা চিন্তার সঙ্গে সবাই খুশিমনেই যুক্ত থাকে। নিজেদের ক্লাসের ছোট্ট সমস্যার কী চমৎকার সমাধান তারা করে ফেলল!

আমরা দৈনন্দিন জীবনে, চলতে ফিরতে প্রতিনিয়ত নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হই। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, সমস্যা হলো একটি অনাকাঙ্ক্ষিত বা ক্ষতিকর পরিস্থিতি বা বিষয়, যা আমাদের কাটিয়ে উঠতে হয়। এবার এসো, আমরা আমাদের চারপাশে বিশেষত বিদ্যালয়ে এবং বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে আসতে প্রতিনিয়ত যেসব সমস্যার মুখোমুখি হই সেগুলো খুঁজে বের করি। যেমন ধরো, ক্লাসে খাবার পানির সংকট, বসার সিটের অব্যবস্থাপনা, ক্লাব কার্যক্রমের কোনো সমস্যা, উপকরণ রাখার বা প্রদর্শনের সমস্যা, টয়লেট ব্যবহারে বিশৃঙ্খলা, ইনডোর গেমস এর অব্যবস্থাপনা, তোমাদের বাড়ি থেকে প্রতিষ্ঠানে আসার পথের কোনো সমস্যা (রাস্তার ছোটখাটো গর্ত, বুলিইং, বৃক্ষ নিধন, মশার প্রজনন ক্ষেত্র) ইত্যাদি নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে সম্ভাব্য সমাধানের প্রয়াস চালাতে পারো।

চিত্র ৬.১: টয়লেটের অপরিচ্ছন্ন ব্যবহার !

চলো, শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে দলে বিভক্ত হয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থান পরিদর্শন করি এবং দলগত আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজ দলের ঘরটি পূরণ করি–

ছক ৬.১ : সমস্যা অনুসন্ধান

দল	সমস্যার ধরন	সমস্যা
ক দল	অবকাঠামোগত	১। .... ২। .... ৩। ....
খ দল	খেলাধুলা, ক্রীড়াসংক্রান্ত	১। .... ২। .... ৩। ....
গ দল	সাংস্কৃতিক কার্যক্রমসংক্রান্ত	১। .... ২। .... ৩। ....
ঘ দল	বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উপযোগী পরিবেশ সংক্রান্ত	১। .... ২। .... ৩। ....
ঙ দল	ঝরে পড়া ও অনিয়মিত শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক কোনো সমস্যা	১। .... ২। .... ৩। ....
চ দল	বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার পথের কোনো সমস্যা	১। .... ২। .... ৩। ....

সমস্যা খুঁজে বের করতে গিয়ে তোমরা প্রয়োজন হলে তোমাদের শিক্ষক, উপরের ক্লাসের শিক্ষার্থী, আয়া, দপ্তরী, মালী, দাড়োয়ান, পরিচ্ছন্নতা কর্মীসহ অন্যান্য যে কারও সঙ্গে কথা বলে এ বিষয়ে জেনে নিতে পারো। স্থানীয় কোনো সমস্যা হলে এই সমস্যা সমাধানে কাজ করতে পারেন অথবা সহায়তা/পরামর্শ দিতে পারেন এমন ব্যক্তিদের তালিকা করে তাদের মতামত সংগ্রহ করা যেতে পারে। সমস্যাটি সম্পর্কে ভালোভাবে জানার জন্য তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য নিতে পারো। প্রয়োজন হলে তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েও সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিতে পারো।

আমরা সবাই পথ চলতে গিয়ে কম হোক বেশি হোক, প্রতিদিনই কোনো না কোনো সমস্যায় পড়ি। সমস্যা হলো একটি অপ্রত্যাশিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা, যা কারও ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে এবং সবাই এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চায়। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক যেকোনো ক্ষেত্রেই আমরা সমস্যার মুখোমুখি হতে পারি। সমস্যা সামনে এলে ভয় পেলে চলবে না, বরং সাহস ও বুদ্ধি দিয়ে এর মোকাবিলা করতে হবে । সমস্যার সমাধান যে প্রক্রিয়ায় করা হয়ে থাকে তার কিছু সাধারণ ধাপ আছে। ধাপে ধাপে অগ্রসর হলে ভালো হয়। চলো, আমরা একনজরে দেখে নিই– আমরা সবাই পথ চলতে গিয়ে কম হোক বেশি হোক, প্রতিদিনই কোনো না কোনো সমস্যায় পড়ি। সমস্যা হলো একটি অপ্রত্যাশিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা, যা কারও ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে এবং সবাই এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চায়। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক যেকোনো ক্ষেত্রেই আমরা সমস্যার মুখোমুখি হতে পারি। সমস্যা সামনে এলে ভয় পেলে চলবে না, বরং সাহস ও বুদ্ধি দিয়ে এর মোকাবিলা করতে হবে । সমস্যার সমাধান যে প্রক্রিয়ায় করা হয়ে থাকে তার কিছু সাধারণ ধাপ আছে। ধাপে ধাপে অগ্রসর হলে ভালো হয়। চলো, আমরা একনজরে দেখে নিই–

সমস্যা চিহ্নিত করা → সমস্যার ধরন ও কারণ খুঁজে দেখা → সম্ভাব্য সমাধান বের করা → সমাধান নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ → সমাধান বাস্তবায়ন → সমাধান মূল্যায়ন

যেকোনো সমস্যা সামনে এলে প্রথমেই এর কারণ অনুসন্ধান করতে হবে।

- কী কারণে সমস্যাটি তৈরি হয়েছে তা খুঁজে বের করতে হবে।
- এরপর উক্ত কারণগুলো পর্যালোচনা করে সম্ভাব্য সমাধানের এক বা একাধিক উপায় বের করতে হবে।
- সমাধানের সম্ভাব্য উপায়গুলোর মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি সুবিধাজনক সেটি বেছে নিতে হবে।
- এরপর উক্ত সমাধানের কৌশলগুলো বাস্তবে প্রয়োগ বা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।
- বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করে উক্ত সমাধানের উপায়টি কতটা ফলপ্রসূ হলো তা যাচাই করে নিতে হবে, যাতে পরবর্তী সময়ে এই ধরনের সমস্যা সমাধানে কার্যকর কৌশল কী তা সহজেই চিহ্নিত করা যায়।

ধাপ অনুযায়ী এবারে সমস্যা নির্বাচনের পালা। তোমরা হয়তো এক বা একাধিক সমস্যা খুঁজে পেয়েছ। সবগুলো সমস্যার সমাধান হয়তো এখনই করে ফেলা সম্ভব নয়। তাই চলো আমরা দলে একটি সমস্যা নির্বাচন করি, যে সমস্যার সমাধানে আমরা প্রয়াস নেব। সমস্যা নির্বাচন করতে তোমরা কয়েকটি বিষয়ে সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করবে–

- সমস্যাটি গুরুত্বপূর্ণ কিনা;
- জরুরি সমাধান প্রয়োজন কিনা;
- তোমাদের দ্বারা উদ্যোগ নেয়া সম্ভব কিনা;
- সমাধান করা হলে তোমরা এবং অন্যরা কতটা উপকৃত হবে ইত্যাদি।

নিজেদের দলে বিষয়গুলো ভালোভাবে আলোচনা করে প্রত্যেক দল একটি করে সমস্যা নির্বাচন করো। এই দলগত আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে তোমরা তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারো। নিজেদের দলে ঝগড়াও শুরু হয়ে যেতে পারে! কিন্তু আমরা তা চাই না। আমরা চাই, দলে সবাই শান্তিপূর্ণ আলোচনা এবং যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে ঐকমত্যের ভিত্তিতে যেন একটি বিষয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নাও। এ কারণে তোমাদের শিখতে হবে কার্যকর যোগাযোগের কলাকৌশল। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা। এই দক্ষতা অর্জন করলে ব্যক্তিগত অনেক সমস্যাই সহজে সমাধান করা সম্ভব।

চিত্র ৬.২: দলগত যোগাযোগ

সমস্যা সমাধানে যোগাযোগ দক্ষতা

যোগাযোগ দক্ষতা হলো নিজেকে সঠিকভাবে প্রকাশ করা এবং অন্যের দেয়া তথ্য সঠিকভাবে গ্রহণ করার ক্ষমতা; অন্যের কথা মনোযোগের সঙ্গে এবং সক্রিয়ভাবে শোনার দক্ষতা; সর্বোপরি অন্যকে দোষারোপ না করে এবং অন্যের মনে কষ্ট না দিয়ে গঠনমূলক সমালোচনা করতে পারা। আমরা একে অন্যের সঙ্গে বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করে থাকি। কখনও লিখিতভাবে, কখনও মৌখিকভাবে, কখনও শরীরী ভাষায়, যেমন- দেহভঙ্গি, চেহারায় সুখ ও দুঃখের ভাব, চোখের ইশারা, গলার স্বরের ওঠানামা কিংবা স্পর্শ ইত্যাদি। এগুলো সবই যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় বিবেচ্য বিষয়। যোগাযোগ কতটা কার্যকর হবে তা এগুলোর ওপর অনেকাংশেই নির্ভর করে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, যোগাযোগে দুটো পক্ষ থাকে– বার্তা প্রেরক (Encoder) এবং বার্তা গ্রাহক (Decoder)। বার্তা প্রেরক যদি সঠিকভাবে বার্তা প্রস্তুত করে যথাযথভাবে বার্তাগ্রাহকের কাছে পৌছাতে পারেন, অন্যদিকে বার্তাগ্রাহক যদি সঠিকভাবে বার্তাটি বোঝেন এবং সেই অনুযায়ী সাড়া দেন এবং কাজ করেন, তাহলেই যোগাযোগ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। মনে রাখবে, যোগাযোগ একটি উভয়মুখী প্রক্রিয়া। যোগাযোগের জন্য তথ্য আদান-প্রদান কিংবা কোনো আলোচনার সাফল্য তাই উভয় পক্ষের ওপর নির্ভর করে। এ কারণে আমাদের যোগাযোগে সফল হওয়ার জন্য বেশ কিছু গুণাবলির চর্চা করা প্রয়োজন। খেলার মাঠে, নিজ বাড়িতে কিংবা কর্মক্ষেত্রে নিজে ভালো থাকার এবং সবাইকে ভালো রাখার জন্য এই গুণগুলো আমরা নিয়মিত অনুশীলন করব। এসো, জেনে নিই যোগাযোগ কার্যকর করার ক্ষেত্রে আমরা সব সময় কোন কোন দিকগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখব-

চিত্র ৬.৩ : বিভিন্নভাবে যোগাযোগ

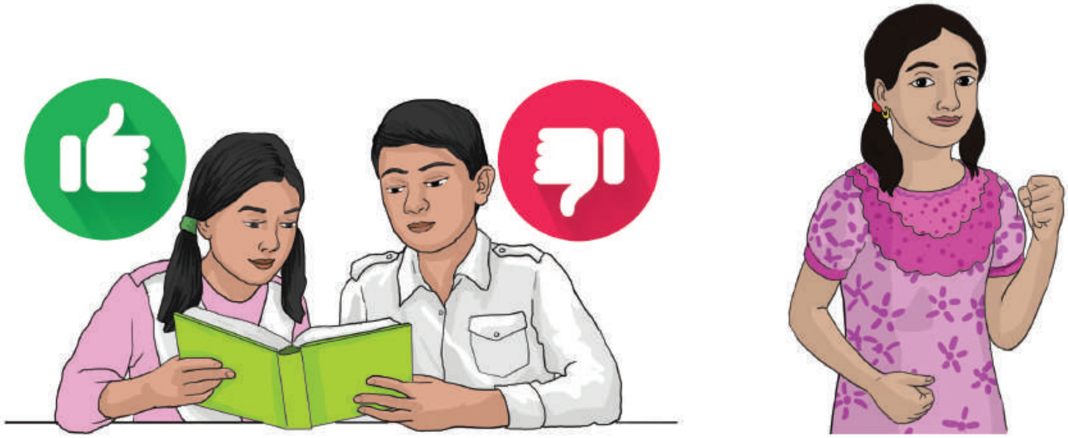

চিত্র ৬.৪ : নিজের প্রতিক্রিয়া জানানো

চিত্র ৬.৫ : ইশারা ভাষায় যোগাযোগ

- মনোযোগ দিয়ে শুনব
- বলার সময় সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্টভাবে বলব
- বুঝতে না পারলে প্রশ্ন করে বুঝে নেবো
- অন্যকে দোষারোপ বা আঘাত করে কথা বলব না
- আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তি দিয়ে বলব
- যা বলছ তা চেহারায় ফুটিয়ে তুলব
- বন্ধুত্বপূর্ণ, সহনশীল মনোভাব বজায় রাখব
- গঠনমূলক সমালোচনা করব
- অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করব
- নিজের অবস্থানে অনমনীয় থাকব না, অর্থাৎ অন্যের গ্রহণযোগ্য যুক্তি বা পরামর্শ মেনে নেওয়ার প্রবণতা দেখাব।

তোমরা নিজেদের জীবনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা ভেবে দেখ, অনেক কিছুই তোমরা পাবে যেখানে হয়তো তোমাদের ভালো যোগাযোগ দক্ষতার অভাবে কাজটি ভেস্তে গেছে। আবার উল্টোটাও হতে পারে, হয়তো ভালোভাবে যোগাযোগের কারণে তোমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে; তুমি যা প্রত্যাশা করেছিলে তা পেয়ে গিয়েছ। তাই আমাদের প্রত্যেকেই কার্যকর যোগাযোগের বিষয়ে অনেক বেশি সচেতন হতে হবে। মনে রাখবে-

**‘যোগাযোগ যদি হয় আন্তরিক ও কার্যকর
সমাধান হবে সমস্যার সদাই বরাবর’**

কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতার অনুশীলন

এখানে কয়েকটি ঘটনা দেওয়া আছে। এগুলো পড়ে তোমাদের দলে আলোচনা করো এবং কীভাবে কার্যকর যোগাযোগ করে সমস্যাটি কাটিয়ে ওঠা যায় তা লেখ। ভূমিকাভিনয় করে অন্য বন্ধুদের দেখাও।

ক) তুমি বাসে ওঠার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছ। লম্বা লাইন। এমন সময় একজন এসে মাঝখানে তোমার সামনে ঢুকে গেল। লোকটা নিয়ম ভঙ্গ করেছে। তুমি এখন কী করবে?

খ) তুমি ফুটবল খেলতে ভালোবাসো। কিন্তু প্রতিদিনই ফুটবল খেলতে গিয়ে তুমি হাতে, পায়ে, নাকে, মুখে বা কোথাও ব্যথা পেয়ে বাড়ি ফিরে আসো। এতে মা রাগ করে বললেন, 'এখন থেকে তোমার ফুটবল খেলতে যাওয়া বন্ধ।' তুমি এখন কী করবে?

গ) তুমি প্রতিদিন বান্ধবীদের সঙ্গে স্কুলে যাও। রাস্তায় যাওয়ার পথে চায়ের দোকানের সামনে প্রায়ই কয়েজন দুষ্ট ছেলে তোমাকে ও তোমার বান্ধবীদের উদ্দেশ করে টিপ্পনী কাটে, হাসাহাসি করে। তুমি/তোমরা এখন কী করবে?

ঘ) টিফিন ঘন্টায় তোমরা কয়েকজন মিলে মাঠে বসে গল্প করছিলে। এমন সময় দোতলার বারান্দা থেকে একজন বোতল থেকে পানি নিয়ে হাত ধুচ্ছিল আর পানির ছিটা এসে তোমাদের গায়ে পড়ল। তোমরা এখন কী করবে?

ঙ) তোমাদের ক্লাসে গণিতের স্যার ভীষণ কড়া। তিনি একটানা অঙ্ক করিয়ে যান। মাঝখানে কেউ প্রশ্ন করলে রাগ করেন। তুমি কিছুতেই অঙ্কের দুটো জায়গায় বুঝতে পারছ না। তোমার পাশের জনও বুঝতে পারছে না। তুমি/তোমরা এখন কী করবে?

চ) তোমাদের ক্লাসে একজন সহপাঠী খুব আবেগপ্রবণ। অল্পতেই কষ্ট পায়; কান্নাকাটি করে। দুষ্টামীর ছলে কেউ তাকে কিছু বললেও সে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে। একদিন বেঞ্চ টান দিতে গিয়ে ওর ব্যাগটি নিচে পড়ে যায়। তখন বাংলার ক্লাস চলছিল। ও চিৎকার দিয়ে কাঁদতে শুরু করল। সবাই ঘাবড়ে গেল। তুমি/তোমরা এখন কী করবে?

দলগতভাবে সমস্যার সমাধান খুঁজি

আমরা কার্যকর যোগাযোগের কলাকৌশলগুলো জেনে নিয়েছি। এবার আমরা ইতোপূর্বে দলগত আলোচনার মাধ্যমে আমরা যে সমস্যার সমাধানে কাজ করব বলে বেছে নিয়েছিলাম সেটি নিয়ে একটু ভাবব এবং নিজ নিজ দলে আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত সমস্যাটির সমাধানের উপায়গুলো খুঁজে বের করব। এর জন্য তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন হতে পারে। তোমরা তো নিশ্চয়ই তোমাদের ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞানসহ অন্যান্য বিষয়ে এই ধরনের তথ্য সংগ্রহের অনুশীলন করেছ, তাই না! তাহলে এবার তোমরা যে সমস্যা সমাধানে কাজ করবে, তা নিয়ে একটি পরিকল্পনা করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করো। কার্যকর যোগাযোগ কৌশল প্রয়োগ করে উক্ত সমস্যার কয়েকটি সমাধানের পথ খুঁজে বের করো। মনে রেখো, যেকোনো সমস্যা থেকে উত্তরণের অনেক পথ থাকে। অর্থাৎ সমস্যা হয়তো একটাই, কিন্তু সমাধান অনেকগুলো! তাই চল–

একের অধিক উপায় খুঁজি

সমস্যার সমাধান করি।

ছক ৬.২: সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে বের করা

নির্ধারিত সমস্যা	সম্ভাব্য সমাধানসমূহ
দলের নাম : সমস্যার ক্ষেত্র : সমস্যার বিবরণ :	উপায় ১ :
	উপায় ২ :
	উপায় ৩ :

যেকোনো সমস্যা সমাধানের একাধিক উপায় রয়েছে। তোমরাও যে সমস্যার সমাধান করতে চাও, তার জন্য একাধিক সমাধানের উপায় খুঁজে বের করেছ। এবার কার্যকর যোগাযোগের উপায় ও কৌশল অনুসরণ করে একাধিক সমাধান থেকে সবচেয়ে কার্যকর একটি সমাধান দলে আলোচনা করে খুঁজে বের করো। সবচেয়ে কার্যকর সমাধানের উপায় বের করার ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করো–

উক্ত সমাধানগুলোর মধ্যে যেকোনো একটিকে বেছে নিয়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী তোমরা কাজ শুরু করো। সমাধানের উপায় বাছাই করার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখবে–

- সমাধান তোমাদের আওতায় (সক্ষমতা/সামর্থ্য) আছে কিনা;
- কোনো আর্থিক খরচের সংশ্লেষ থাকলে সেটা বহন করা সম্ভব কিনা;
- কতটা কম সময়ে করা যাবে;
- সম্ভাব্য উপায়টি স্থায়ী/ টেকসই কিনা;
- স্থানীয় সহায়তা পাওয়া যাবে কিনা;
- সহজে কাজটি করা যাবে কিনা;

যেকোনো সমস্যারই অনেক ডাল-পালা থাকে। আমরা সেগুলোর হয়তো সমাধান করতে পারব না। তবে যেসব সমাধান আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে রয়েছে, সেগুলো সমাধানের জন্য প্রয়াস চালানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া মানেই হলো সমস্যার সঙ্গে আরও কিছুদিন বসবাস করা। তাতে আমরা সবকাজেই পিছিয়ে পড়বো। তাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই এসো সবাই-

বিচার করে সূক্ষ্মভাবে, তথ্য জমাই ভান্ডারে,
যোগাযোগে পটু হয়ে সমস্যাকে যাই উতরে।

ছক ৬.৩: সমস্যার সমাধান পর্যালোচনা

সমস্যা	সমস্যার সমাধানের উপায়	উপায়টি বেছে নেওয়ার যৌক্তিক কারণ

এবার নির্ধারিত সমস্যার সমাধানের পালা। তোমরা নির্ধারিত সমস্যার নির্দিষ্ট একটি সমাধানের উপায় চিহ্নিত করেছ। এবার সমস্যাটি সমাধান করার জন্য দলে আলোচনা করে দায়িত্ব ঠিক করে নাও। মনে রাখবে, দায়িত্ব ভাগ করে নেবার ক্ষেত্রেও কার্যকর যোগাযোগের কৌশল তোমাদের কাজে লাগবে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দক্ষতাকে তোমার বিবেচনায় রাখতে পারো। সমাধানের উপায় বিবেচনা করে কে কোন দায়িত্ব পালন করবে, কখন পালন করবে, কীভাবে পালন করবে তার একটি সম্পূর্ণ পরিকল্পনা তৈরি করো এবং সেই অনুযায়ী সমাধানের প্রয়াস গ্রহণ করো। এক সপ্তাহ পরে দলগত সমস্যা সমাধান সম্পর্কে শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক রিপোর্ট করো।

সমস্যা সমাধানে আমার প্রয়াস

স্বমূল্যায়ন

এই অধ্যায়ে আমরা যা যা করেছি.. ... ... টিক (✓)চিহ্ন দাও

কাজসমূহ	করতে পারিনি(১)	আংশিক করেছি (৩)	ভালোভাবে করেছি (৫)
পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে সমস্যা চিহ্নিতকরণ			
সমাধানের উদ্দেশ্যে সমস্যা নির্বাচন করা			
নির্বাচিত সমস্যার একাধিক সমাধান খুঁজে বের করা			
কার্যকর যোগাযোগের উপায় অনুসন্ধান			
সমস্যার সমাধান করার ক্ষেত্রে কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতার অনুশীলন			
একাধিক সমাধান থেকে যেকোনো একটিকে নিয়ে কাজ করা			
মোট স্কোর : ৩০ তোমার প্রাপ্ত স্কোর :			
শিক্ষকের মন্তব্য:			

তোমার প্রাপ্তি? তুমি যা পেলে তা নিয়ে তোমার মনের অবস্থা চিহ্নিত করো	 একদম ভালো লাগছে না; সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি দক্ষতা এবং বিষয় সম্পর্কে আমার জানা এবং চর্চা করা খুব জরুরি।	 আমার ভালো লাগছে ; কিন্তু সমস্যা সমাধানের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি দক্ষতা এবং বিষয় সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানা ও চর্চা করা প্রয়োজন।	 আমার বেশ ভালো লাগছে ; সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি দক্ষতার উন্নয়নে নিয়মিত চর্চা আমি অব্যাহত রাখব।

... সব সময় সবাই মিলে এমন হাসি হাসতে চাই।।

সুতরাং এভাবে হাসতে হলে এই অধ্যায়ের যেসব বিষয়গুলো আমাকে আরো ভালোভাবে জানতে হবে তা লিখি

আমার যোগাযোগ ও সমস্যা সমাধান দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আমাকে নিয়মিত যেসব চর্চা চালিয়ে যেতে হবে সেগুলো লিখি

স্কিল কোর্স ৯

কুকিং

ভাত রান্না

রাইয়ান ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। তার মা-বাবা দুজনই চাকুরি করেন। বাড়িতে যখন থাকেন, তখন দুজনেই ভাগাভাগি করে পরিবারের নানা কাজ করেন। রাইয়ানের মা-বাবা রোজ সকাল ৮টায় অফিসের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। অফিসে যাওয়ার আগে বাবা বিছানাপত্র গোছান, ঘর-দোর পরিষ্কার করেন; আর মা সবার জন্য নাস্তা তৈরি করেন, রাইয়ান আর তার ছোট বোনের টিফিন বক্সে খাবার প্রস্তুত করে দেন, দুপুরের জন্যও সবার খাবার রান্না করেন। অফিস থেকে ফিরেন সন্ধ্যায় । বাড়িতে ফিরে এসেই আবার রান্নাঘরের কাজ শুরু করেন। বাবা-মায়ের কষ্ট দেখে রাইয়ানও খুব কষ্ট পায়। তাদের কষ্টটা সে একটু কমাতে চায় । তার খুব ইচ্ছা মায়ের কাজে সাহায্য করা। একদিন রাইয়ান মায়ের কাছে গিয়ে বলল, 'মা, আমাকে রান্না শিখিয়ে দাও। আমি তোমাকে রান্নায় সাহায্য করতে চাই'। রাইয়ানের কথায় মা খুব খুশি হন। তিনি আদর করে বলেন, 'ঠিক আছে, আগামীকাল আমার অফিস বন্ধ। তোমাকে কালকে ভাত রান্না করা শেখাব'।

ভাত বাঙালির প্রধান খাদ্য। পৃথিবীর অনেক দেশের মানুষেরই প্রধান খাবার ভাত। বিশ্বে বিভিন্ন জাতের ভাতের চাল আছে । আবার দেশভেদে ভাত রান্নার পদ্ধতিও একেক রকম। চালের বহুরূপতা ও রান্নার পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে ভাতের ক্যালরি , শর্করা এবং আঁশের পরিমানে ভিন্নতা ঘটে থাকে। যেমন- সাদা ভাত, লাল চালের ভাত, আতপ চালের ভাত, সিদ্ধ চালের ভাত, মোটা কিংবা চিকন চালের ভাত।

ভাতে আছে ভিটামিন ও খনিজ । আমরা ভাত থেকে বি ভিটামিন পাই, যা স্নায়ুতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য।

এই পাঠ শেষে আমরা-

পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে, সহজ উপায়ে (পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে) নিরাপদে ভাত রান্না করতে পারব।

ভাত রান্নার আগে আমাদেরকে যা যা শিখে নিতে হবে:

- চাল পরিমাপ করা
- চাল ধোয়া
- চুলা জ্বালানো

সিদ্ধ চাল, চিকন বা মোটা, আতপ চাল সব ধরণ দিয়েই ভাত রান্না করা যায়। তবে বিভিন্ন রকমের চাল দিয়ে ভাত রান্না করার ক্ষেত্রে পানির পরিমানে সামান্য কম বেশি দেয়া প্রয়োজন হয়।

এসো করি

রাইয়ানের মা ছুটির দিনে রাইয়ানকে বললেন, 'চল আমরা ভাত রান্না শিখি।

ভাত রান্না করতে যা যা লাগবে-

- চাল- ১ কাপ
- পানি- ৩ কাপ (চালের তিনগুণ পানি

রাইয়ানের মা যেভাবে তাকে ভাত রান্না শেখালেন, এখানে সেগুলো ধাপে ধাপে বর্ণনা করা হলো

ধাপ- ১

প্রথমে ১ কাপ চাল পরিমাপ করে নাও। চালে পাথর, কাকর, ধান থাকতে পারে, এজন্য পানি দিয়ে ধোয়ার আগে শুকনো অবস্থায়ই ভালোভাবে বেছে নাও।

ধাপ- ২

বেছে নেওয়া চাল পাত্রে / হাড়িতে ঢেলে পরিষ্কার পানি দিয়ে ২/৩ বার ধুয়ে নাও। এখন হাড়িতে ধোয়া চালে ৩ কাপ পানি দাও।

সতর্কতা

- প্রতিবার ধোয়ার সময় চাল ছেঁকে যখন পানি ফেলবে তখন সতর্ক থাকতে হবে পানির সাথে যেন চাল পড়ে না যায় ।
- ধোয়ার সময় লক্ষ্য রাখবে পরনের জামা-কাপড় যেন ভিজে না যায়।

ধাপ- ৩

চুলা সাবধানে জ্বালাও। ঢাকনা দিয়ে ডেকে চুলার আঁচ বাড়িয়ে দাও । কাছে দাঁড়িয়ে ৫/৬ মিনিট অপেক্ষা করো। পানি ফুটে উঠলে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনা সরিয়ে দিয়ে চুলার আঁচ মাঝামাঝি করে দাও। চামচ বা খুন্তি দিয়ে ভাত নেড়ে দাও (একেক চাল ফুটে ওঠার সময় চালের ধরন অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে)।

সতর্কতা

- ফুটে উঠার আগ পর্যন্ত চুলার কাছাকাছি থাকতে হবে, তা না হলে পানি ফেনাসহ ফুলে উঠে পানি পড়ে গিয়ে চুলা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
- খুন্তি দিয়ে নাড়ার সময় হাত নিরাপদ দূরুত্বে রাখতে হবে । সম্ভব হলে হাতে কিচেন গ্লাভস পরে নেয়া যেতে পারে।
- খুন্তি দিয়ে উল্টানোর সময় ভাতের হাড়ি তাপরোধী কিছু দিয়ে (কাপড়/ধরনি) ধরে নিতে হবে, তা না হলে হাড়ি বেশি চাপ লেগে পড়ে যেতে পারে।

ধাপ- ৪

ভাতের পানি একটু কমে এলে চুলার আঁচ একদম কমিয়ে দাও। পানি শুকিয়ে এলে কিছুক্ষণ ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দাও। পুরোপুরি পানি টেনে এলে চুলা বন্ধ করে দাও।

ব্যস, হয়ে গেল ঝরঝরে বসানো ভাত।

সতর্কতা

- পানি শেষ হয়ে গেলে সাথে সাথে চুলা বন্ধ করে দিতে হবে, ত না হলে হাড়ির নিচে পোড়া লেগে যেতে পারে।

এসো ভেবে দেখি

ক) চাল ৩বার ধোয়ার পরও কি আরও ধোয়ার প্রয়োজন ছিল?

খ) ভাতের মাড় পড়ে কি চুলা নিভে গিয়েছিল?

গ) রান্নার পর ভাত কি বেশি নরম বা শক্ত হয়েছে?

ঘ) ভাত রান্না করতে পেরে তোমার কেমন লাগছে?

ঙ) ভাত রান্নার সময় আরও কি কি সতর্কতা আমাদের মেনে চলা প্রয়োজন?

কী শিখলাম

- চাল পরিষ্কার করা
- চলার আঁচ সম্পর্কে ধারণা
- ভাত রান্নার পদ্ধতি ধারাবাহিক অনুসরণ করা
- --------------------------------------
- --------------------------------------

এসো নিজে নতুনভাবে বানাই

আমাদের বাড়িতে চালের ভিন্ন ভিন্ন ধরন ও পরিমান অনুযায়ী ভাত রান্না করার প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী চাল দিয়ে বাড়িতে বাবা-মা, কিংবা বড় কারও সহায়তা নিয়ে ভাত রান্না অনুশীলন করো। স্কুলে সহপাঠিরা মিলে নিজেদের ক্লাসে রান্না করে শিক্ষককে দেখাও। বাড়িতে প্রয়োজন অনুযায়ী অনুশীলন করো, বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে অন্যদের পরিবেশন কর এবং ছবি তুলে রাখ কিংবা এঁকে রাখ।

স্বমূল্যায়ন

তোমরা ভাত রান্না করার সময় কয়েকটি অবস্থার ছবি তুলবে অথবা নিচের বক্সে এঁকে রাখবে। সেগুলো শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী একদিন ক্লাসে এনে দেখাবে। যদি ছবি প্রিন্ট করার সুযোগ পাও, তাহলে একটি সাদা কাগজে প্রিন্ট দিয়ে কেটে কেটে এখানে লাগিয়ে দাও।

চালের পরিমাপ নেয়া	চাল ধোয়া
পরিমানমতো পানি দেয়া	রান্না করা ভাত

অভিভাবকের মতামত

কাজটি করতে গিয়ে আমার অনুভূতি

(ভালো লাগা, মন্দ লাগা, কাজটি করতে গিয়ে আঘাত পাওয়া কিংবা কোনো বাধার সম্মুখীন হওয়া এবং নতুন কী শিখেছো তা এখানে লিখ)

ডিমভাজা

ডিম খুবই সুস্বাদু এবং অতি পরিচিত পুষ্টিকর একটি খাবার। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, দেহের গঠন ও বৃদ্ধির জন্য প্রতিদিন প্রোটিন জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। ডিম হলো প্রোটিনের খুব ভালো উৎস। তোমার বয়সী ছেলেমেয়েরা প্রতিদিন ১টি করে ডিম খেলে সে সুস্থ থাকবে এবং বয়স অনুযায়ী বৃদ্ধি ঠিক থাকবে। চোখের সুস্থতার জন্যও প্রতিদিন ডিম খাওয়া জরুরি। ডিমে প্রোটিনের পাশাপাশি ভালো পরিমাণে ভিটামিন এ এবং ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। ডিমে দেহের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়।

ডিম রান্না করাও সহজ। যখন ইচ্ছে হবে, তখনই তোমার পছন্দ অনুযায়ী ডিম রান্না করে খেতে পারবে। ভাজা, সিদ্ধ, পোঁচ, তরকারি ইত্যাদি বিভিন্নভাবে ডিম খাওয়া যায়। তাছাড়া ডিম দিয়ে সুস্বাদু ও বৈচিত্র্যময় নাস্তা তৈরি করে খাওয়া যায় ও বিভিন্ন পরিবেশে পরিবেশন করা যায়।

এই পাঠ শেষে আমরা-

সহজ উপায়ে, নিরাপদে ও অল্প সময়ে ডিম ভাজি করতে পারব।

ডিম ভাজার আগে আমাদেরকে যা যা শিখে নিতে হবে:

- পেঁয়াজ ও কাঁচা মরিচ কুঁচি করে কাটা
- চুলা জ্বালানো
- থালা-বাটি ইত্যাদি পরিষ্কার করে ধোয়া

মুরগির ডিম, হাঁসের ডিম বা অন্য যেকোনো ডিম ভাজার জন্য একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

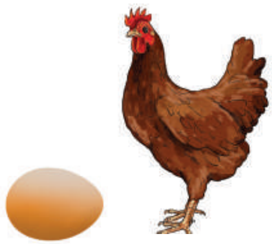

সোনালী মুরগির ডিম

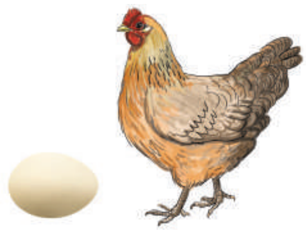

দেশি মুরগির ডিম

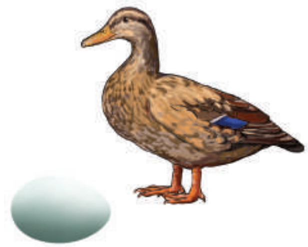

হাঁসের ডিম

এসো করি

রূপকথা ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। অসুস্থতার কারণে তার মায়ের পক্ষে আজ রান্না করা সম্ভব হয়নি। তার বাবাও সকালে অফিসে চলে গেছেন। বাসায় রান্না করার মতো কেউই নেই। ক্ষুধায় কাতর রূপকথা মায়ের কাছে গেল। মা রূপকথাকে বলল, তুমি চাইলে খুব সহজেই একটি ডিম ভাজি করে খেতে পারো। ডিম রূপকথার পছন্দের খাবার হওয়ায় সে খুব খুশি হলো। কিন্তু পরক্ষনেই বলল, 'আমিতো ডিম ভাজি করতে পারিনা মা!' মা রূপকথাকে আদর করে কাছে বসালেন এবং বললেন, 'তুমি অবশ্যই পারবে! কীভাবে ডিম ভাজতে হয় তা আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনো। তাহলে তুমিও পারবে '। মা বলতে শুরু করলেন-

ডিমভাজার জন্য যা যা লাগবে

ডিম- ১টি, পেঁয়াজ (ছোট আকারের)-১ টি, কাঁচামরিচ- ১ টি, তেল-১ চা চামচ

রূপকথার মা তাকে ধাপে ধাপে যেভাবে ডিমভাজা শেখালেন-

ধাপ-১

প্রথমে বটি বা ছুরি, বাটি, চামচ, কড়াই, খুন্তি, প্লেট পরিষ্কার করে ধুয়ে নাও।

সতর্কতা

- বটি বা ছুরি সাবধানে নাড়াচাড়া করবে, হাতে লাগলে কেটে যেতে পারে।
- ধোয়ার সময় লক্ষ্য রাখবে পরনের জামা-কাপড় যেন ভিজে না যায়।

ধাপ-২

প্রথমে বটি বা ছুরি, বাটি, চামচ, কড়াই, খুন্তি, প্লেট পরিষ্কার করে ধুয়ে নাও।

সতর্কতা

- পেঁয়াজের মুখ কাটার সময় বটি বা ছুরি সাবধানে চালাবে ।
- ধোয়ার সময় লক্ষ্য রাখবে পরনের জামা-কাপড় যেন ভিজে না যায়।

এবার একটি পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে হবে। প্রথমে পেঁয়াজের মুখ ও পেছনের অংশ কেটে নিবে, এরপর খোসা ছাড়িয়ে নাও। এবার খোসা ছাড়ানো পেঁয়াজ ও একটি কাঁচামরিচ পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নাও।

ধাপ-৩

প্রথমে পেঁয়াজটিকে দুইভাগ করে নাও। বটিতে কাটলে একটি ভাগ বটির মাথায় গেঁথে দাও, তাহলে কাটার সময় এর ঝাঁজ চোখে লাগবে না। এবার সাবধানে বাকী অংশ ও কাঁচামরিচ কুচি করে কেটে বাটিতে রাখ। কাঁচামরিচ কাচি দিয়ে কাটতে বেশি সুবিধা, তাতে হাত দিয়ে কাটা অংশ ধরতে হয়না, দ্রুত ও নিরাপদে কাটা যায়।

সতর্কতা

- পেঁয়াজ কাটার সময় বটি বা ছুরি সাবধানে চালাবে ।
- পেঁয়াজ কাটার সময় ঝাঁজ বের হতে পারে, চোখে পানি এসে ঝাপসা হয়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে চোখ মুছে নিবে।
- মরিচ কাটার শেষ হলে সঙ্গে সঙ্গে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিবে । তা না হলে যেখানে হাত লাগবে সেখানেই জ্বালা করতে পারে।

ধাপ- ৪

সাবধানে বাটির উপর রেখে ডিমটি ফেটিয়ে নাও (বাটির কোনায় বা শক্ত কোথাও ঠেস দিয়ে ফেটতে হবে)।

সতর্কতা

- ☠ ডিমটি ভালোভাবে ধরবে যাতে ফাটানোর সময় পড়ে না যায় ।
- ☠ কোনোভাবেই যেন ডিমের খোসার টুকরো বাটিতে না পড়ে ।

ধাপ- ৫

এরপর ডিমে সামান্য লবন যোগ করো । এবার একটি চামচ অথবা কাঁটাচামচ অথবা বিটার দিয়ে ভালোভাবে ডিম, পেয়াজকুঁচি, কাঁচামরিচকুঁচি ও লবন মিশিয়ে নাও।

সতর্কতা

- ■ আলতোভাবে মেশাবে, বেশি জোরে জোরে নাড়লে বাটিসহ উল্টে পড়ে যেতে পারে ।

ধাপ- ৬

এরপর খুব সাবধানে চুলা জ্বালাও (নিজে না পারলে কারো সাহায্য নাও)। একটি কড়াই চুলায় দিয়ে তাতে এক চা চামচ তেল দাও। কড়াই ও তেল গরম হলে তাতে ডিমের মিশ্রণটি সাবধানে তেলের উপর ঢেলে দাও।

সতর্কতা

- ☠ আগুনের বিষয়ে খুব সাবধানে থাকবে।
- ☠ ডিমের মিশ্রণ ঢালার সময় তেল ছিটে আসতে পারে, তাই হাত নিরাপদ দূরুত্বে রাখতে হবে। সম্ভব হলে হাতে কিচেন গ্লাভস পরে নিতে পারো।

ধাপ- ৭

ডিম ফুলে উঠলে খুন্তি দিয়ে উল্টে দাও। সামান্য বাদামী বর্ণের হলে ডিম চুলা থেকে নামিয়ে প্লেটে রাখ। ব্যস, হয়ে গেল, ডিম ভাজা।

সতর্কতা

- আগুনের বিষয়ে খুব সাবধানে থাকবে।
- খুন্তি দিয়ে উল্টানোর সময় কড়াইয়ের হাতল তাপরোধী কিছু দিয়ে (কাপড়/ধরনি) ধরে নিতে হবে, তা না হলে কড়াই বেশি চাপ লেগে পড়ে যেতে পারে।

বর্ণনা শেষ করে মা রূপকথাকে বললেন, 'যেকোনো সমস্যা হলে আমাকে ডাকবে। অবশ্য তুমি ইচ্ছে করলে ইউটিউবে সার্চ দিয়ে ডিমভাজার ভিডিও দেখে নিতে পারো। আচ্ছা মা, এবার যাও আয়োজনে লেগে পড়!'

রূপকথা এতক্ষণ ধৈর্য্য সহকারে মায়ের কথা শুনল। এরপর সে রান্না ঘরে চলে গেল। কিছুক্ষনের মধ্যেই ডিমভাজার গন্ধ বাড়িময় ছড়িয়ে পড়ল। রূপকথা একটি প্লেটে ডিমভাজা নিয়ে বীরের ভঙ্গিতে মায়ের সামনে এসে দাঁড়ালো। মা রূপকথাকে খুশিতে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, শুধু ডিমভাজাও হতে পারে তোমার নাস্তা। তোমার যখনই ইচ্ছা হবে বা ক্ষুধা পাবে এভাবে ডিম ভেজে ভাতের সাথেও খেতে পারবে'।

এসো ভেবে দেখি

- ডিম ভাজার জন্য কী কী তেল ব্যবহার করা যাবে?
- ডিমভাজা কি নাস্তা হিসাবে খাওয়া যাবে?
- ডিম ভাঙার সময় কী রকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে?
- পেঁয়াজ কাঁটার সময় কেমন লেগেছিল?
- ডিম ভাজার সময় আরও কী কী সতর্কতা মেনে চলা প্রয়োজন?
- ডিম তেলে ছাড়ার সময় তেল ছিটার হাত থেকে বাঁচার উপায় কী?

কী শিখলাম

- সকল উপকরণ ও সরঞ্জাম পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নেয়া।
- ছুরি, বটি ইত্যাদি ধারালো সরঞ্জাম সাবধানে ব্যবহার করা ও কাজ শেষে সঠিক স্থানে গুছিয়ে রাখা।

- ডিমভাজার পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা।
- ---
- ---
- ....

এসো নিজে নতুনভাবে বানাই

ডিমের সাথে আরও কিছু যোগ করে কিংবা ডিজাইন করে ভিন্নভাবে কীভাবে ডিম ভাজা যায়, তা নিয়ে একটু ভাবো। তোমার নতুন কোনো আইডিয়া দিয়ে (যেমন ডিমের সাথে পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, লবনের সাথে টমেটো, ধনেপাতা কুচি অল্প পরিমাণে যোগ করে অথবা চামচ/ফয়েল দিয়ে ভিন্ন আকারে) ডিম ভাজো এবং শিক্ষককে দেখাও। বাড়িতে প্রয়োজন অনুযায়ী অনুশীলন করো, বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে অন্যদের পরিবেশন কর এবং ছবি তুলে রাখ কিংবা এঁকে রাখ

স্বমূল্যায়ন

তোমরা ডিম ভাজি করার সময় কয়েকটি অবস্থার ছবি তুলবে অথবা নিচের বক্সে এঁকে রাখবে। সেগুলো শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী একদিন ক্লাসে এনে দেখাবে। যদি ছবি প্রিন্ট করার সুযোগ পাও, তাহলে একটি সাদা কাগজে প্রিন্ট দিয়ে কেটে এখানে লাগিয়ে দাও।

পেঁয়াজ, মরিচ ইত্যাদি কাটা	ডিম ফেটানো
কড়াইতে ঢালা	প্লেটে পরিবেশন

অভিভাবকের মতামত

কাজটি করতে গিয়ে আমার অনুভূতি

(ভালো লাগা, মন্দ লাগা, কাজটি করতে গিয়ে আঘাত পাওয়া কিংবা কোনো বাধার সম্মুখীন হওয়া এবং নতুন কী শিখেছো তা এখানে লেখো)

আলু ভর্তা

পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় 'ছুটি'কে সবাই ডাকতো আলু নামে। এর পিছনে গল্পটা খুব দারুণ। ক্লাসে সবার সাথেই ছুটির খুব ভাব ছিল। যাকেই জিজ্ঞেস করা হতো সে-ই বলতো, 'ছুটি আমার বেস্ট (সবচেয়ে ভালো) ফ্রেন্ড!' সব তরকারিতে আলু যেমন ভালো মানায় তেমনি ক্লাসের সবার সাথেই ছুটি খুব ভালো মানিয়ে চলে; এজন্যে দুষ্টরা সবাই আদর করে তাকে আলু ডাকতো। তাদের পর্যবেক্ষণটা কিন্তু বেশ মজার ! আমাদের দেশে আলু প্রধান খাবার না হলেও সহায়ক খাবার হিসাবে প্রায় সব কিছুর সাথেই আলু ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে সব ছাড়িয়ে ভাতের সংগে আলু ভর্তা আমাদের দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী খাবার। ছোট শিশু থেকে বৃদ্ধ প্রায় সবার পছন্দ আলু ভর্তা। আমরা আলু থেকে শুধু যে শর্করা পাই তা নয়, এতে আছে ভিটামিন সি, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স । আলু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে, মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়াতে, হজমে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে, মানসিক চাপ কমাতে সহায়তা করে। এত যার উপকারিতা সেই আলু দিয়ে আমরা একটি সহজ ও মজার খাবার বানানো শিখব।

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে সহজ উপায়ে মজাদার আলু ভর্তা তৈরি করতে পারবে।

আলু ভর্তা বানানোর আগে আমাদেরকে যা যা শিখে নিতে হবে:

- পেঁয়াজ ও কাঁচা মরিচ কুঁচি করে কাটা
- আলু সিদ্ধ করা এবং এর খোসা/চামড়া উঠানো (ছেলা)
- চুলা জ্বালানো

যেকোনো আলু যেমন জাম বা ললিতা (ছোট, বড় আকৃতির) ভর্তা করার জন্য একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। অনেকে আলুর সাথে সিদ্ধ ডিম , শিম, বেগুন, কাঁঠালের বিচি ইত্যাদিও যুক্ত করে থাকে।

চিত্র : নানাজাতের আলু

এসো করি

বাদল ও তার সহপাঠীরা একদিন টিফিনের সময় সবার পছন্দের খাবারের কথা বলছিল । বাদলের বন্ধু মেঘ কিছুদিন আগে ওদের স্কুলে ভর্তি হয়েছে। সে বলল, আলু দিয়ে তৈরি যেকোনো খাবারই তার পছন্দ। টিফিনে সে প্রায়ই আলু দিয়ে বানানো খাবার নিয়ে আসে। গল্পচ্ছলে সে বলল যে তার দাদাভাই খুব ভাল রান্না করেন। তাদের বাড়িতে যৌথ পরিবার হওয়ায় রোজ অনেক রান্না করতে হয়। দায়িত্ব ভাগ করে দাদা-দাদি, চাচা-চাচী সবাই একেকদিন রান্না করেন। সেও তাদের সঙ্গে থেকে থেকে অনেক রান্না শিখেছে। সে বলল, 'দাদাভাইয়ের কাছ থেকে এসব শিখে আমি নিজেই সব রান্না করি আর নিশ্চিন্তে আরাম করে খাই। আলু দিয়ে আমি এখন আমি নানাপদও রান্না করতে জানি'। তার গল্প শুনে সবাই তাকে অনুরোধ শুরু করলো, আমরা তো ভাত রান্না আর ডিম ভাজা শিখেছি , তুমি তাহলে আমাদেরকে আলু ভর্তা বানানো শিখিয়ে দাও'। তাদের অনুরোধে মেঘ তখন বিজ্ঞের মতো শেখানো শুরু করলো, 'আলুভর্তা হলো এমন একটি খাবার, যা খুব সহজে তৈরি করা যায় এবং খেতেও সুস্বাদু। এটি গরম ভাত কিংবা পান্তা ভাতের সাথে খেতে খুবই মজা'।

এরপর ধাপে ধাপে বর্ণনা করে ক্লাসের সবাইকে শেখানো শুরু করল।

আলু ভর্তা করতে যা যা লাগবে-

আলু-৩/৪ টি, পেয়াজ-২টি (ছোট আকারের), কাঁচা মরিচ ২/৩ টি, লবণ-স্বাদমতো, তেল- ১ চা চামচ (সরিষা)

আলু ভর্তা বানানোর জন্য ছবিতে দেয়া ধাপ অনুসরণ করি

আলু ভর্তা বানানোর জন্য ছবিতে দেয়া ধাপ অনুসরণ করি

ধাপ-১

প্রথমে বটি, ছুরি, বাটি, প্লেট পরিষ্কার করে ধুয়ে নাও। তিন/চারটি আলু নাও এবং পানি দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে নাও।

সতর্কতা

- বটি বা ছুরি সাবধানে নাড়াচাড়া করবে, হাতে লাগলে কেটে যেতে পারে।
- ধোয়ার সময় লক্ষ্য রাখবে পরনের জামা-কাপড় যেন ভিজে না যায়।

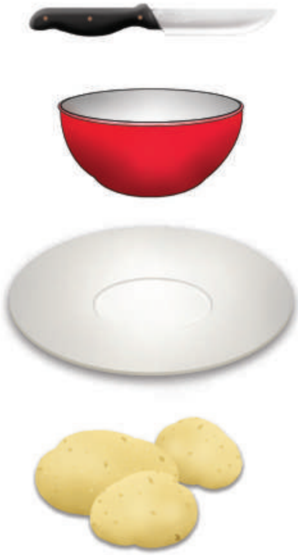

ধাপ-২

একটি পাত্রে ধোয়া আলুগুলো রেখে এর মধ্যে পানি ঢালো যাতে পানির লেভেল আলুগুলোর দুই-তিন ইঞ্চি উপরে থাকে। চুলায় আগুন জ্বালিয়ে আলু সেদ্ধ করো। উচ্চজ্বালে আলু সিদ্ধ হতে আনুমানিক ১৫-২০ মিনিট সময় লাগে। আলু সিদ্ধ হলো কিনা তা চামচ বা খুন্তির সাহায্যে পরখ করে দেখতে হবে।

সতর্কতা

- আগুনের বিষয়ে খুব সাবধানে থাকবে।
- আলু সিদ্ধ হলো কিনা তা চামচ বা খুন্তির সাহায্যে পরখ করে দেখার সময় হাত নিরাপদ দূরুত্বে রাখতে হবে । সম্ভব হলে হাতে কিচেন গ্লাভস পরে নেয়া যেতে পারে।
- খুন্তি দিয়ে পরখ করার সময় পাত্রটি তাপরোধী কিছু দিয়ে (কাপড়/ধরনি) ধরে নিতে হবে, তা না হলে পাত্রটি বেশি চাপ লেগে পড়ে যেতে পারে।

ধাপ-৩

আলু যখন সিদ্ধ হচ্ছে তখন ভর্তার জন্য পেঁয়াজ, মরিচ প্রস্তুত করে নাও। একটি কাঁচা মরিচ ও একটি পেয়াঁজ খোসা ছাড়িয়ে ভালো করে ধুয়ে নাও। ডিমভাজার জন্য যেভাবে পেঁয়াজ ও কাঁচা মরিচ কুচি কুচি করে কেটেছিলে, ঠিক সেভাবে পেঁয়াজ ও কাঁচা মরিচ কুচি কুচি করে কেটে নাও।

সতর্কতা

- পেঁয়াজ কাটার সময় বটি বা ছুরি সাবধানে চালাবে।
- পেঁয়াজ কাটার সময় ঝাঁজ বের হতে পারে, চোখে পানি এসে ঝাপসা হয়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে আগে চোখ মুছে নেবে।

ধাপ-৪

আলু সিদ্ধ হয়ে গেলে ঠান্ডা হবার জন্য কিছুক্ষণ সময় অপেক্ষা করো। সিদ্ধ আলু ঠাণ্ডা হলে হাত পরিষ্কার করে ধুয়ে ভালোভাবে মুছে নিয়ে একটা একটা করে আলুর খোসা ছাড়িয়ে নাও। আলু হাত দিয়ে চেপে চেপে ভর্তা করে একটি পাত্রে রাখো।

সতর্কতা

- বেশি গরম অবস্থায় ধরা যাবে না; একটু ঠান্ডা হলে খোসা ছাড়াতে হবে।

ধাপ-৫

এখন কুচি করা পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ ও স্বাদ অনুযায়ী লবণ একত্রে ভালোভাবে মেখে নাও। এর সাথে ভর্তা করা আলু ও ১ চা চামচ সরিষার তেল দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে মেখে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে সুস্বাদু আলু ভর্তা।

সতর্কতা

- মরিচের কারণে হাত জ্বলতে পারে তাই মাখানো শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিবে।

এসো ভেবে দেখি

- এই পদ্ধতি ব্যবহার করে অন্য কোনো সবজি দিয়ে কি ভর্তা বানানো যাবে?
- আলুর আকৃতি বড় হলে সিদ্ধ করার সময় কি করা যেতে পারে?
- এই কাজের বিশেষ সাবধানতাগুলো কি কি ?

কী শিখলাম

- সকল পাত্র, উপকরণ ও সরঞ্জাম পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নেয়া।
- ছুরি, বটি ইত্যাদি ধারালো সরঞ্জাম সাবধানে ব্যবহার করা ও কাজ শেষে সঠিক স্থানে গুছিয়ে রাখা।
- আলু সিদ্ধ করার পর পাত্রে কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে ঠান্ডা হবার জন্য যাতে গরম আলু বা পানি লেগে হাত পুড়ে না যায়।
- আলু ভর্তা করার কলাকৌশল
- ---------------------------------
- ---------------------------------

এসো নিজে নতুনভাবে বানাই

আরো অনেকভাবে আলু ভর্তা বানানো যায়, যেমন- শুকনো মরিচের গুড়া, ধনেপাতা বা অন্য কোনো সিদ্ধ সবজি মিশিয়ে। ধরন ও পরিবেশনে বৈচিত্র্য এনে তোমার নিজের পছন্দমতো আলু ভর্তা বানাও এবং শিক্ষককে দেখাও। বাড়িতে প্রয়োজন অনুযায়ী অনুশীলন করো, বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে অন্যদের পরিবেশন কর এবং ছবি তুলে রাখ কিংবা এঁকে রাখ।

স্বমূল্যায়ন

তোমরা আলু ভর্তা করার সময় কয়েকটি অবস্থার ছবি তুলবে অথবা নিচের বক্সে এঁকে রাখবে। সেগুলো শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী একদিন ক্লাসে এনে দেখাবে। যদি ছবি প্রিন্ট করার সুযোগ পাও, তাহলে একটি সাদা কাগজে প্রিন্ট দিয়ে কেটে কেটে এখানে লাগিয়ে দাও।

পেঁয়াজ, মরিচ ইত্যাদি কাটা	আলুর খোসা ছাড়ানো
ভর্তা করা	প্লেটে পরিবেশন

অভিভাবকের মতামত

কাজটি করতে গিয়ে আমার অনুভূতি

(ভালো লাগা, মন্দ লাগা, কাজটি করতে গিয়ে আঘাত পাওয়া কিংবা কোনো বাধার সম্মুখীন হওয়া এবং নতুন কী শিখেছো তা এখানে লেখো)

স্কিল কোর্স ২

গ্রাফটিং বা জোড়কলম

গ্রাফটিং (Grafting) বা জোড়কলম

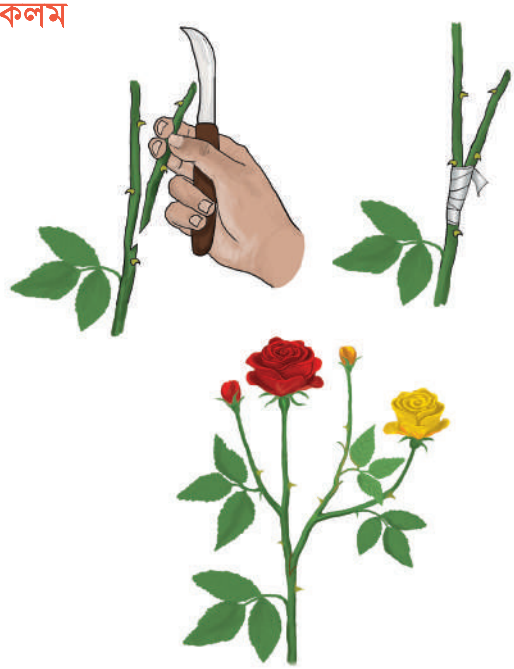

এ পাঠ শেষে আমরা-

পরিবেশ ও উপযোগিতা বুঝে স্বল্প ব্যয়ে বিভিন্ন রকমের গাছে গ্রাফটিং করতে পারব।

সেতু ও রিক্তা দুই বন্ধু। সেতুদের বাড়ি গাছ গাছালিতে ভরা। রিক্তা তাদের বাড়িতে এলেই পুকুর পাড়ে আমবাগানের ছায়ায় এক্কা দোক্কা, সাত গুটি, কানামাছি এসব খেলে। এবছর ওদের পুকুরঘাটের গাছটায় অনেক আম ধরেছে, রং টাও বেশ জমে এসেছে। লোভ সামলাতে না পেরে সেতুর মায়ের অনুমতি নিয়ে রিক্তা আর বশু মিলে সেদিন গাছের ডালে উঠে কোচড় ভরে বেশ কয়েকটা আম পেড়ে আনলো। তারপর বশু, হেনা, মিলনসহ সবাই মিলে ভাগাভাগি করে খেয়ে বেশ তৃপ্তি পেল। অপূর্ব স্বাদের এই আম খেয়ে সবাই মুগ্ধ। এতো সুস্বাদু আম রিক্তা এর আগে কখনও খায়নি। কৌতুহলী হয়ে সেতুর কাছে জানতে চাইলো, এটার বীজ রোপন করলে আমাদের বাড়িতেও এমন সুস্বাদু আম গাছ হবে? করিম চাচা পুকুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাদের কথা শুনে হেসে বললেন, 'শোনো, একাজে বীজও লাগবে না। তুমি চাইলে গাছটির ডাল কেটে নিয়ে তোমাদের কোনো টক আম গাছে লাগিয়ে দিলেও সেগাছে এরকম মিষ্টি আম ধরবে। এর নাম হলো গ্রাফটিং'।

সবাই অবাক হয়ে বলল, 'তাই নাকি চাচা!'

করিম চাচা শুরু করলেন, 'গ্রাফটিং এর মাধ্যমে যদি মিষ্টি বা সুস্বাদু জাতের একটি ডাল তোমাদের টক আম গাছে এনে জোড়া লাগিয়ে দেয়া যায় তাহলে তোমাদের গাছের জোড়া দেয়া নতুন ডাল হতে ঠিক একইরকম সুস্বাদু ও মিষ্টি আম পাওয়া যাবে'।

রিক্তার অস্থিরতা বেড়ে গেল। বলল, ' চাচা, আপনি আগে আমাদের কথা দিন, কীভাবে একাজ করা যায় তা আমাদেরকে শেখাবেন'।

তাদের কৌতুহল দেখে করিম চাচা এক গাল হেসে বললেন, ঠিক আছে, তা নয় হয় শেখাবো। কিন্তু তার আগে তোমরা ভেবে বলতো এর সুবিধা কী?

বশু বললো, ‘এটা তো সহজ কথা, বীজ থেকে গাছ হয়ে আম ধরা পর্যন্ত লম্বা সময় লাগে। গ্রাফটিং করলে আগে থেকেই গাছ থাকবে, বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না’।

সেতু বলল, ‘বসু ঠিক বলেছে, তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যাবে, তাই না চাচা!’

করিম চাচা বললেন, ‘ হু! তাছাড়া এভাবে জোড় লাগানো গাছে মা গাছের প্রায় সব গুণাগুণ ও স্বাদ অক্ষুন্ন থাকে এবং চাইলে এর মাধ্যমে চারা তৈরি করে সারা দেশে উন্নত জাতের গাছ ছড়িয়ে দেয়া যায়’।

রিক্তা বলল, ‘বুঝেছি খুব, এবার তো আমাদের কাজটা শেখানো শুরু করেন, চাচা!’

করিম চাচা সবাইকে শেখানো শুরু করলেন। তিনি তাদের কী কী শেখালেন এবার সবাই জেনে নিই-

গ্রাফটিং বা জোড় কলম

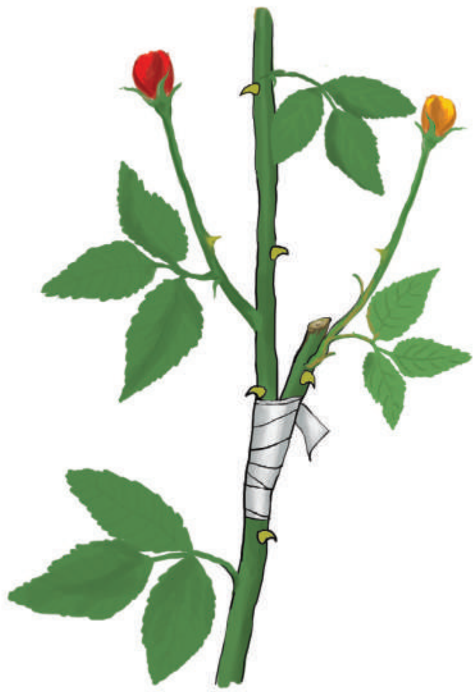

‘গ্রাফটিং এর আরেক নাম হলো- জোড় কলম। জোড় কলমে দুটি গাছ লাগবে। একটি হলো- মাতৃগাছ অর্থাৎ যে গাছ থেকে ডাল নেয়া হবে, অন্যটি হলো যে গাছে জোড়া লাগানো হবে সেই গাছ । আমরা যে গাছের সাথে নতুন একটি ডাল এনে জোড়া লাগাবো ঐ গাছটিকে আদিজোড় (Root stock) বলে। এখানে রিক্তাদের বাড়ির টক আম গাছে যদি সেতুদের মিষ্টি জাতের ডাল জোড়া লাগানো হয় , তাহলে রিক্তাদের টক আম গাছটি হলো আদিজোড়।

অন্যদিকে চাহিদাকৃত যে ডালটি এনে আদিজোড়ের সাথে জোড়া লাগানো হবে তাকে উপজোড় বলে। এখানে সেতুদের মিষ্টি আম গাছ হতে ডাল এনে রিক্তাদের টক আম গাছে জোড়া লাগানো হলে মিষ্টি আম গাছের ডালটি হলো উপজোড়। উপজোড়ের আরেক নাম হলো সায়ন (Scion)।

গাছের আদিজোড় ও উপজোড় পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যখন একটি একক গাছ হিসেবে বড় হয়ে উঠে তখন এ প্রক্রিয়াকে জোড় কলম বা গ্রাফটিং বলে। সহজভাবে বলা যায়, জোড় কলমের জোড়া স্থানের নিচের অংশকে আদিজোড় এবং উপরের অংশ হলো উপজোড় বা সায়ন ।

তোমরা নিশ্চয়ই গ্রাফটিং বা জোড় কলম এর জন্য প্রয়োজনীয় আদিজোড় ও উপজোড় বুঝতে ও চিনতে পেরেছ। চাহিদা অনুযায়ী উপজোড় সংগ্রহ করে আদিজোড়ের সাথে জোড়া লাগিয়ে নতুন চারা বা কলম তৈরি করা হয়।

কী কী গাছে গ্রাফটিং করা যায়

সাধারণত লেবু, আম, কাঁঠাল, সফেদা, কুল/বড়ই, গোলাপ ইত্যাদি গাছে এ ধরনের কলম বা গ্রাফটিং করা হয়। দ্বিবীজপত্রী সকল গাছেই গ্রাফটিং করা যায়।

আদিজোড় ও উপজোড় নির্বাচনের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে কিছু বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন

আদিজোড় নির্বাচনের ক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয়

কোনো গাছের চারাকে যদি আদি জোড় (Root stock) হিসেবে নেয়া হয়, তাহলে এর বয়স এক থেকে দেড় বছর হতে হবে। আবার যদি বড় গাছের একটি শাখাওকে আদিজোড় হিসেবে নেয়া হয়, তাহলে উক্ত শাখার বয়সও এক থেকে দেড় বছর হতে হবে। তবে গোলাপের ক্ষেত্রে বয়স হবে ৩-৪ মাস হতে হয়। গোলাপ গাছের ক্ষেত্রে ১ সে. মি. ডায়ামিটার হতে হবে।

- চারা স্বাস্থ্যবান, নিরোগ ও পেন্সিলের মত মোটা হতে হবে।
- চারা বা শাখাটি শক্ত কাঠের মত হতে হবে।

উপজোড় নির্বাচনের ক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয়

- একটি সুস্থ সবল বড় গাছ হতে উপজোড় সংগ্রহ করতে হবে।
- উপজোড় শাখার বয়স আদিজোড় শাখার বয়সের সমান হতে হবে।
- উপজোড় শাখার আকার আদিজোড় শাখার সমান হতে হবে।

উপযুক্ত সময়

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস এই কলম করার উপযুক্ত সময়। অর্থাৎ বর্ষার ঠিক আগে আগে জোড় কলম করার জন্য ভালো সময়।

কলম করার যন্ত্রপাতি ও উপকরণ

কলম করার জন্য কিছু যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। সেগুলো হলো:

কলম করার ছুরি বা চাকু

আদিজোড় (Rootstock) এবং উপজোড়ে (Scion) ‘V’ আকৃতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

প্রুনিং শিয়ার

গাছের ডাল-পালা ছাঁটাইওয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়।

পলিব্যাগ

আদিজোড়ের সাথে উপজোড়কে স্থাপন করার পর তাদের জোড়া লাগা পর্যন্ত উপজোড়কে ঢেকে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয় (অতিরিক্ত প্রশ্বেদন এড়ানোর জন্য) ।

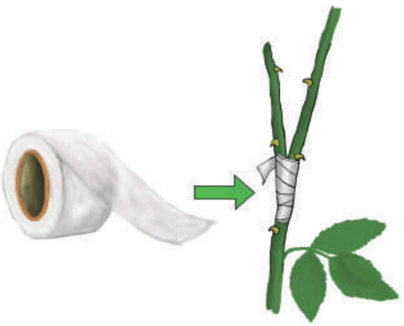

পলিথিন টেপ

আদিজোড়ে উপজোড়কে স্থাপন করার পর জোড়ার স্থানকে শক্তভাবে মুড়িয়ে দেয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়, যাতে জোড় স্থানে পানি না ঢোকে।

গ্রাফটিং এর ধাপসমূহ

ক) আদিজোড় প্রস্তুতকরণ

- মাটি থেকে ১৫-২৫ সে:মি: উঁচুতে চারার যেকোনো একপাশে ৩-৫ সেন্টিমিটার লম্বা করে ওপর থেকে নিচে তীর্যকভাবে বাকলসহ কাঠের সামান্য অংশ ধারালো ছুরি দিয়ে কাটতে হবে।
- কর্তনকৃত ডালের নিচের অংশে ‘V’ আকৃতির একটি পকেট তৈরি করতে হবে।

সতর্কতা

চাকু দিয়ে ডাল কাঁটার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অবশ্যই এই কাজের সময় বাড়ির বড় কাউকে সঙ্গে থাকতে হবে।

চিত্র: আদিজোড় (Rootstock)

খ) উপজোড় প্রস্তুতকরণ

- উপজোড় এর জন্য ২-৩ টি কুড়িসহ ডাল নির্বাচন করতে হবে।
- ধারালো ছুরি দিয়ে আদিজোড়ের কর্তন অংশের সমান করে (৩-৫ সে:মি) উপজোড়টি তৈরি করতে হবে।
- উপজোড়ের কর্তন অংশের পিছনে 'V' আকৃতি করে দিতে হবে যাতে করে আদিজোড়ের কর্তন অংশের সাথে উপজোড়টি হুবহু মিলে যায়।

সতর্কতা:

চাকু দিয়ে ডাল কাঁটার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অবশ্যই এই কাজের সময় বাড়ির বড় কাউকে সঙ্গে থাকতে হবে।

চিত্র: উপজোড় (Scion)

গ) জোড়া লাগানো

- আদিজোড় ও উপজোড় এর কাটা অংশ মুখোমুখি করে মিলিয়ে এমনভাবে মিশাতে হবে যাতে ভিতরে কোনো ফাঁক না থাকে।
- এরপর পলিথিন টেপ দিয়ে শক্ত করে পেঁচিয়ে বেঁধে দিতে হবে।

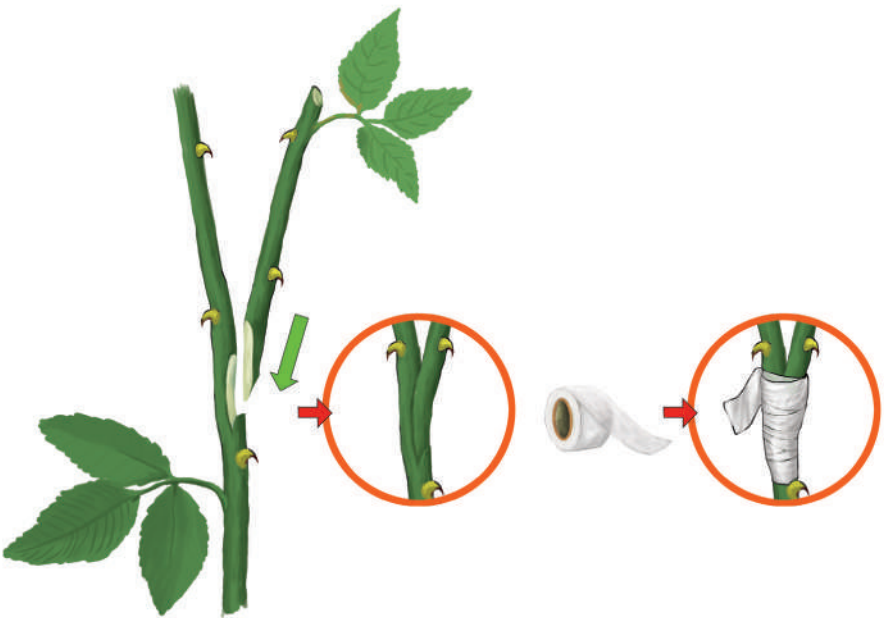

- উপজোড়টিকে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- ২-৩ সপ্তাহের মধ্যেই আদিজোড়ের সাথে উপজোড় জোড়া লেগে যাবে।
- উপজোড়ের কুঁড়ি ফুটে নতুন পাতা বের হবে।
- এ সময় পলিথিন খুলে দিতে হবে।
- আদিজোড় ও উপজোড় জোড়া লেগে গেলে পেঁচানো পলিথিন টেপ ছিঁড়ে বা ব্লেড দিয়ে হালকা করে কেটে দিতে হবে। তবে বেশিরভাগ সময় এটা এমনিতেই ছিঁড়ে যায়।

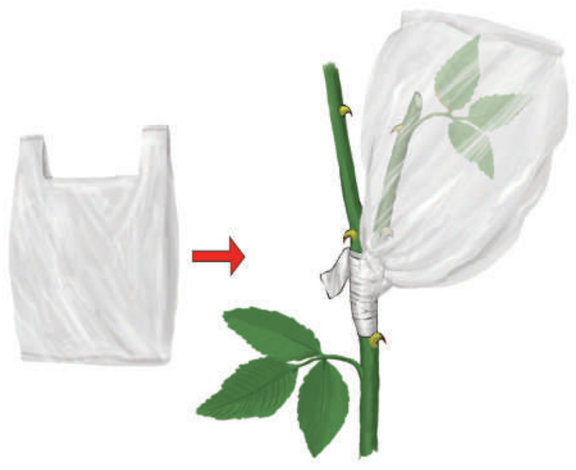

চিত্র: আদিজোড় ও উপজোড়

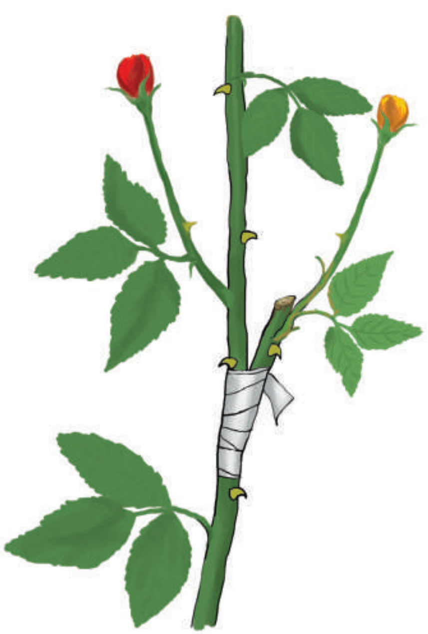

আন্তঃপরিচর্যা

- উপজোড় এর নতুন পাতা যখন আস্তে আস্তে বড় হয়ে সবুজ রং ধারণ করবে তখন আদিজোড়ের উপরের এক-তৃতীয়াংশ কেটে দিতে হবে। এতে উপজোড়ের বৃদ্ধি দ্রুততর হবে।
- এক সপ্তাহ পর আদিজোড়ের উপরের অংশের পাতা ও ডাল সম্পূর্ণরূপে কেটে সরিয়ে ফেলতে হবে।
- এরপর আদিজোড়ের সাথে উপজোড় সংযুক্ত হয়ে নতুন গ্রাফটিং বা কলমের চারা তৈরি হবে।

জোড় কলমের সফলতার জন্য কয়েকটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে

- উপজোড় ও আদিজোড়ের বয়স, আকার ও আকৃতির দিক থেকে পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
- আদি জোড় এবং উপজোড় এমনভাবে পলিথিন ফিতা দিয়ে বাঁধতে হবে যাতে এর ভিতর কোনো ফাঁক না থাকে এবং পানি প্রবেশ না করে।
- সঠিক মৌসুমে (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে) জোড় কলম করতে হবে।

করিম চাচা তাদেরকে ২/৩ দিন ধরে গ্রাফটিং হাতে কলমে শেখালেন এবং অনেক অজানা তথ্য তাদের জানালেন। তিনি বললেন, মজার বিষয় হলো, আজকাল অনেকেই গ্রাফটিং করে বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করে অনেক উপার্জন করে থাকেন। কেউ কেউ আবার গ্রাফটিং করার ভিডিও তৈরি করে ইউটিউবে ছেড়ে দিয়েও অনেক আয় করেন। তোমরাও ইচ্ছে করলে ইন্টারনেটের বিভিন্ন পেইজ থেকে, ইউটিউব থেকে গ্রাফটিং করা শিখতে পারো। আমাদের সরকারি হর্টিকালচার সেন্টার অথবা উপজেলা কমপ্লেক্সে কৃষি কর্মকর্তা রয়েছেন। তোমরা ইচ্ছে করলে তাদের কাছ থেকেও সহায়ক পরামর্শ নিতে পারো সরকারিভাবে তারা অনেক সময় এই ধরনের গ্রাফটিং এর উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। গ্রাফটিং শিখে তোমরা নিজেরাই একগাছে নানা রঙের ফুল ফোটাতে পারবে, নিজের বা অন্যের নার্সারিতে সহায়তা করতে পারবে। স্থানীয় কোনো সাধারণ জাতের সাথে গ্রাফটিং এর মাধ্যমে অনেক উন্নত জাতের ফুল ও ফলের চারা তৈরি করা সম্ভব। ফলন ভালো হচ্ছে না এরকম কোনো গাছে তোমরা ইচ্ছে করলেই গ্রাফটিং করে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারবে। তবে, মনে রাখবে একবার চেষ্টাতেই সবাই কাজটিতে সফল নাও হতে পারো। এটা বিশেষ সূক্ষ্ম একটি কাজ তাই কাজটি মনোযোগ দিয়ে ধৈর্য্য সহকারে বার বার অনুশীলন করে হাত পাকাপোক্ত করতে হবে'।

সেতু, বশু, মিলন ও রিক্তা প্রত্যেকেই নিজেদের টবে কিংবা বাগানে একটা করে গাছে গ্রাফটিং করেছে। ওরা এগুলোর নিয়মিত পরিচর্যা করে যাচ্ছে। খুব শীঘ্রই তারা ফলন দেখতে পাবে। আর ফলনের খেয়ে দেখার আগাম আমন্ত্রণ তারা করিম চাচাকে জানিয়ে রেখেছে। এবার শুধু খুশি মনে অপেক্ষার পালা।

স্বমূল্যায়ন

তোমরা গ্রাফটিং এর কাজ করার সময় কয়েকটি অবস্থার ছবি তুলবে অথবা এখানে দেওয়া বক্সগুলোতে এঁকে রাখবে। সেগুলো শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী একদিন ক্লাসে এনে দেখাবে। যদি ছবি প্রিন্ট করার সুযোগ পাও, তাহলে একটি সাদা কাগজে প্রিন্ট দিয়ে কেটে এখানে লাগিয়ে দাও।

আদিজোড় গাছ	
উপজোড় গাছ	

যেভাবে আদিজোড় কেটেছি	
যেভাবে উপজোড় কেটেছি	
যেভাবে একটির খাঁজে আরেকটি জোড়া গেঁথেছি	
জোড়া লাগানো অবস্থা	
পরবর্তী অবস্থা	

অভিভাবকের মতামত

কাজটি করতে গিয়ে আমার অনুভূতি

(ভালো লাগা, মন্দ লাগা, কাজটি করতে গিয়ে আঘাত পাওয়া কিংবা কোনো বাধার সম্মুখীন হওয়া এবং নতুন কী শিখেছো তা এখানে লিখ)

শিক্ষকের মন্তব্য:

কৃষি উন্নয়নঃ কৃষিতে প্রযুক্তির ছোঁয়া

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। ধানের উৎপাদন তিনগুণেরও বেশি, গম দ্বিগুণ, সবজি পাঁচগুণ এবং ভুট্টার উৎপাদন বেড়েছে প্রায় দশগুণ। শেখ হাসিনা সরকারের যুগোপযোগী পরিকল্পনার পাশাপাশি পরিশ্রমী কৃষক, মেধাবী কৃষি বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণবিদদের যৌথ প্রয়াস ও কৃষিতে লাগসই প্রযুক্তির ছোঁয়ায় এ সাফল্য এসেছে। এভাবেই প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশের তালিকায় উঠে এসেছে বাংলাদেশ।

২০২৩ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণি

জীবন ও জীবিকা

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

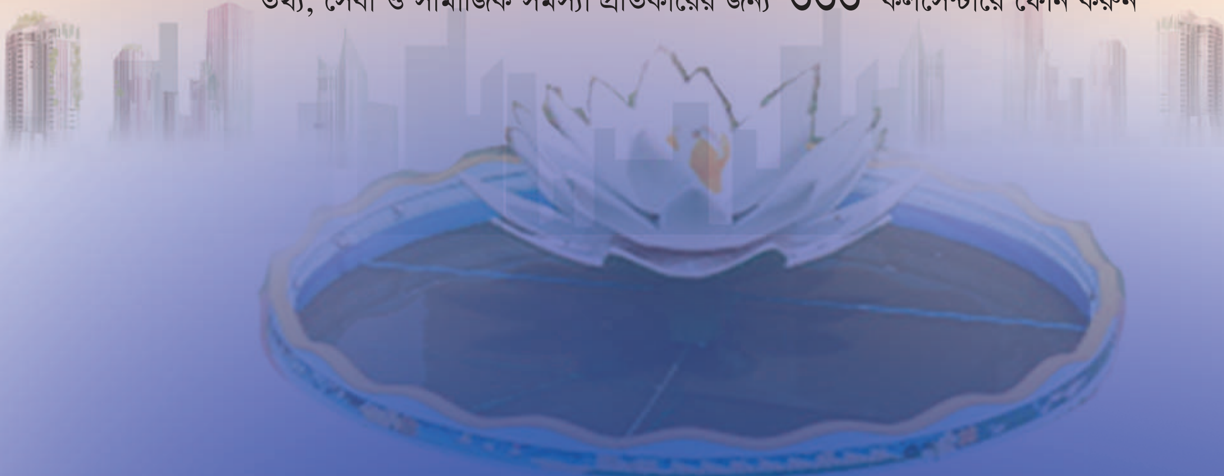

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য